সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ – তাকলিদ কি ?

২ – তাকলীদ কেন ?

৩ – তাকলীদ এর হুকুম কি ?

৪ – আরব আলেমদের দৃষ্টিতে তাকলীদ কি ?

৫ – তাকলিদ আর ইত্তেবা কি ভিন্ন ?

৬ – সাহাবা যুগে কি তাকলীদ ছিল ?

৭ – তাবেয়ী যুগে কি তাকলিদ ছিল ?

৮ – চতুর্থ হিজরীর পূর্বে কি তাকলীদ ছিল ?

৯ - তাকলিদ ছাড়া কি কেউ আছেন ?

১০ – ব্যক্তির কথার অনুসরণ নাকি দলিলের অনুসরণ ?

তৃতীয় অধ্যায়

১ – হানাফী মাজহাব কি ?

২ – হানাফি মাজহাব এর যাত্রা কিভাবে , কখন থেকে এবং কার মাধ্যমে ?

৩ – হানাফী মাজহাব এর বৈশিষ্ট কি ?

৪ – হানাফি মাজহাব এর উসুল কি ?

৫ – হানাফি মাজহাব এর হাদিস কি জইফ ? ১

৬ – হানাফী মাজহাব এর হাদিস কি জইফ ? ২

৭ – হানাফী মাজহাব এর নির্ভরশীল কিতাব কি ?

৮ – ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর ফতোয়া বোর্ড কি ?

৯ – হানাফী মাজহাব কি ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর চারশত (৪০০) বছর পর প্রতিষ্ঠিত ?

১০ – হানাফী মাজহাব কি সহিহ হাদিস বিরুধী ?

চতুর্থ অধ্যায়

(বিবিধ)

১ – কোর'আন- হাদিস কিভাবে পড়বেন ?

২ – মাসা'আলা জানার জন্য হাদিস নাকি ফিকাহ'র কিতাব পড়বেন ?

৩ – বিভিন্ন এপ্সের মাধ্যমে হাদিসের মান নির্ণয় এর হুকুম কি ?

৪ - ফতোয়া দেওয়ার মূলনীতি কি ?

৫ – ইসলামি আইন কয়ভাগে বিভক্ত ?

৬ – সৌদি আরবে কি হানাফী মাজহাবের আলিম আছেন ?

৭ – সহীহ হাদিস পাইলেই কি আমলযোগ্য হয়ে যায় ?

৮ – সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে ফতোয়া দিতেন ?

৯ – রাসুল ও সাহাবাদের মাজহাব কি ছিলো ?

১০ – মাজহাবের ইমামদের কাছে কি হাদিস পৌঁছে নাই ?

লেখক,পরিচিতি

Details

আব্দুল কারীম আল-মাদানী - সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলাস্থ রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের নয়ামাটি গ্রামে ১৯৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি করে বিশ্বনাথ উপজেলার ‘জামেয়া আরাবীয়া মোহাম্মাদীয়া মাদ্রাসায়’ তাহফিজুল কোর'আন শেষ করেন। অতঃপর, কওমী মাদ্রাসার কিতাব বিভাগে পাঠদানের পাশাপাশি রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান - ‘জামেয়া ইসলামিয়া ইউসুফিয়া তালবাড়ি আলিম মাদ্রাসা’ থেকে দাখিল ও আলিম পরিক্ষা শেষ করেন।

২০১৪ সালের শেষ দিকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিদ্যাপিঠ 'মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ' সৌদি আরবে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেন। একই বছরের শেষ দিকে ফুল স্কলারশিপ পেয়ে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় গমন করেন। প্রথমে 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়' আরবী ভাষা শিক্ষা বিভাগে কোর্স সমাপ্ত করেন। তারপর, ‘ইসলামিক আইন ও বিচার বিভাগে’ স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ।

বারাকাল্লাহু ফীকুম

লেখা,মূল বিষয়,সারাংশ

Details

সত্যি বলতে, এটা মৌলিক গুণে কোন নির্দিষ্ট বই না বরং বিভিন্ন বিষয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় জমাকৃত লেখা সংকলন। বিভিন্ন সময়ে মাযহাব বিষয়ক ও নানান প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সোস্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি করেছি। এতে কিছু দ্বীনি ভাই বই প্রকাশের সু-পরামর্শ দেন । তবে , বিবিধ দিক বিবেচনায় গুগল এপ্স তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি । যদি মহান আল্লাহ তা'লা কবুল করেন !

এপসে মোট পাঁচটা অধ্যায় রয়েছে -

১. ভূমিকা -

এই অধ্যায়টি লেখক পরিচিতি, বই পরিচিতি, লেখক ও পাঠক অভিমত নিয়ে সাজানো হয়েছে।

২. মাযহাব -

এই অধ্যায়ে মাযহাবের মৌলিক কনসেপ্ট ও প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মোট দশটা লেখা আছে। এতে মৌলিক মাযহাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, মাযহাব কেন্দ্রীক কিছু অমূলক প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দেওয়া্র চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. তাকলিদ

এই অধ্যায়ে তাকলিদ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাকলিদের হুকুম, গুরুত্ব কিংবা বিভিন্ন যুগে তাকলিদের বিবরণ নিয়ে মোট দশটা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে ।

৪. হানাফী মাযহাব

এই অধ্যায়ে হানাফী মাযহাবের যাত্রা ও আনুষাঙ্গিক সকল বিষয়ে মোট দশটা লেখা রয়েছে। মাযহাবের বৈশিষ্ট্য, মূলনীতি সহ আরো বেশ কিছু বিষয় সংযুক্তি রয়েছে।

৫. বিবিধ

শেষ অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে দশটা আর্টিকেল রয়েছে। সোস্যাল মিডিয়ায় আমাদের শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, কতটুকু হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক আলোচনা ও পরামর্শ রয়েছে।

আমি শুরুতেই বলেছি, এটাকে মৌলিক কোন বই না বলে বিভিন্ন লেখা সংকলন বলা যায়। কয়েকজন দ্বীনি ভাইয়ের আবদারে এপ্স তৈরী করা। ফলে, এপ্সটিতে সকল ধরণের বৈশিষ্ট্য কিংবা মূলনীতি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

সাধারণ পাঠকের জন্য অতি সাধারণ একটা এপ্স। এই ক্ষুদ্র খেদমত থেকেও কেউ উপকৃত হলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ খুশী হবেন।

লেখক অভিমত

আসসালামু আলাইকুম!

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার চান্স পেয়ে যাই। তখনই আশ-পাশ থেকে অনেকেই বলাবলি শুরু করলেন - সে তো মদীনায় যাওয়া মাত্রই ভিন্ন মতাদর্শী বা মাজহাব বিরোধী হয়ে যাবে। কারণ কি ? যা বুঝলাম, অনেকের ধারণা - মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় মাজহাব বিদ্বেষ তৈরী করে অথবা সেখানে মাজহাবের বিপরীত কিছু শিখানো হয়।

এরকম নানান আলোচনা-সমালোচনা শুনে খানিকটা বিভ্রান্তি হয়ে যাই। একান্ত ভাবলাম, মদীনা হলো ইলমের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে যা পড়ানো বা শিখানো হবে তাই হবে সত্য। সেখানে গিয়ে যদি মাজহাব বিরোধী কিছু পাই আর তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে গ্রহণ করতে অসুবিধা কোথায় ?

যাইহোক, মদীনায় চলে গেলাম। এক এক করে অনেক দিন পার করে ফেললাম। অল্প অল্প করে পড়াশোনা করে বুঝতে পারলাম যে, দেশে থাকাকালীন যা সমালোচনা শুনেছিলাম, তা আদৌও সত্য নয়। এমনকি, একদিন ভাষা কোর্সের একজন সম্মানীত শিক্ষকের সাথে খোলামেলা কথা বলে নিশ্চিত হলাম যে, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কখনো মাযহাব এর বিরোধীতা লালন করে না। বরং, ফিকাহ শাস্ত্রে চার মাজহাবের ইমামদের মতামতই পড়ানো হয়।

ভাষা কোর্স শেষ করে অনার্স ল্যাভেলে উত্তীর্ণ হলাম। অনার্সে সাব্জেক্ট নিলাম - শারীয়াহ বিভাগ। যেখানে ইসলামীক আইন-কানুন ও শারীয়ার সকল মাসালা-মাসাইল পড়ানো হয়।

পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে খুব দ্রুত চাক্ষুষ দেখতে পেলাম যে, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় তো মোটেও মাজহাব বিরোধী নয়, বরং মাযহাবের শিক্ষা-দীক্ষাই দিচ্ছে। ভাবলাম, দেশে কতইনা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। আল্লাহ ক্ষমা করুক!

অনার্স কোর্সে যতো পড়ি, ততো মাজহাবের শিক্ষা পাই আর সম্মানীত চার ইমামদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। আর দেরী কেন ? ভাবলাম, এই ভুল-তথ্যে আটকে আছে হয়তো অনেক সাধারণ মানুষ। তাদেরকে সঠিকটা জানান দিতে হবে। প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মানুষের মাঝে তৈরী হওয়া বিভ্রান্তি দূর করতে হবে।

এক পর্যায়ে এসে লেখালেখি শুরু করি। তখন মানুষের নানান প্রশ্ন আসে, জবাব দিতে চেষ্টা করি। আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে মাজহাবের বিভিন্ন বাস্তবতা নিয়ে লেখি, মাজহাব বিষয়ক নানান প্রশ্নের জবাব দিতে থাকি। এভাবে এক সময় বেশ কিছু লেখা জমা হয়ে যায়।

এরই মধ্যে কয়েকজন সু-হৃদ পরামর্শ দিতে লাগলেন যে, সকল লেখাকে একত্র করে একটা বই বের করা। কেউ বলছেন গুগল এপ্স তৈরী করা। বই নাকি গুগল এপ্স? কোনটি ভালো হবে?

এমন প্রশ্নে সার্বিক দিক বিবেচনায় বইয়ের পরিবর্তে এপ্স তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করি। উল্লেখ্য কারণ দু'টি -

১. একটা বই সহজে সবার কাছে পৌঁছতে পারবে না, তবে আধুনিক এই সময়ে মাত্র অল্প কিছু এম্বী ব্যয় করে সকলের কাছে বিনা মূলে এপ্স পৌঁছে যাবে।

২. বই সবসময় সবার হাতে থাকে না, তবে এপ্স সবার সাথে সবসময় থাকা সম্ভব। যখনই ইচ্ছা পড়তে পারবে, গাড়িতে-বাড়িতে কিংবা শুয়ে-বসে। আবার যখনই প্রয়োজন, সেখান থেকে কপি করে লেখা অন্যকে দিতে পারবে। যা বইয়ের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।

ইত্যাদি ভাবনা থেকে বইয়ের পরিবর্তে এপ্স তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অবশেষ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এপ্সটি সকলের হাতে হাতে পৌঁছে দিতে চেষ্টা শুরু করি। এই কাজে অনেক দ্বীনি ভাই সহযোগিতা করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। সবার জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম বদলা কামনা করি। মহান রাব্বে কারীম যেন পাঠককে সঠিক বুঝার তাওফীক দান করেন।

শেষ কথা, এপ্সটিতে অগুছালো / অপরিপক্ক হাতে লেখা কিছু লেখা রয়েছে। বিভিন্ন পুস্তক পড়ে নানান সময়ে বিবিধ বিষয়ে লিখেছি। অবশেষ দীর্ঘ সময়ের লেখা এক জায়গায় জমা করার চেষ্টা করেছি। এতে ভুল-ভ্রান্তি মানবিক গুণে থাকাটাই স্বাভাবিক। যে কোন প্রকারের ভুল ত্রুটি কারো পরিলক্ষিত হলে প্রথমত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অতঃপর, মেহেরবানী করে আমাকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবগত করবেন। আমি অবশ্যই ঠিক করে নিব, ইনশা আল্লাহ !

আহসানাল্লাহু ইলাইকুম !

আব্দুল কারীম আল-মাদানী

প্রথম রামাদান, ১৪৪২ হিজরী

ইমেইল - abdulkarimchy89@gmail.com

পাঠক অভিমত

১

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হাজারো দুরদ ও সালাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।বর্তমানে আমাদের দেশে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ,হিংসা বিদ্বেষ মূলক কথা বার্তা শুধু তাই নয় উম্মাহ ভিতর বিশাল এক ফাটল ধরে আছে। শুধু মাজহাব নিয়ে। আসলে মাজহাব কি ? মাজহাব কি কুরআন হাদীসের বাহিরে ? না মোটেই না। আসলে কুরআন সুন্নাহ দিয়েই মাজহাব। আবার অনেক বলে থাকি কুরআন ও হাদীস থাকতে কিসের মাজহাব! মূলত মাজহাবের বিষয় জ্ঞানের পরিধি কম থাকায় অজ্ঞাতবসত এসব কথা বার্তা বলে থাকি।মাজহাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে আমরা বিভ্রান্তির ভিতর পরে থাকি। এমনকি ভুল বুঝার ফলে আমরা বিভিন্ন দলে মতে বিভক্তি হয়ে যাচ্ছি। মুসলিম হিসেবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া আমাদের কাম্য নয়। তাই মাজহাব বিষয় সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে শায়খ আব্দুল কারীম আল মাদানী হাফিজুল্লাহ (মদিনা ইউনিভার্সিটির, মদিনা, সৌদি আরব) শত ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে উপহার দিলো।মাজহাব ভিত্তিক আলোচনা নিয়ে সময় উপযোগী মোবাইল অ্যাপ। আমি আশা রাখি, আমরা যারা মাজহাব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও যারা না বুঝে, না জেনে মাজহাবের বিরোধিতা করি। এবং মাজহাব বিরোধী আপত্তিকর দলিল পেশ করি।তারা অতি সহজেই মাজহাব সম্পর্কে বুঝতে ও জানতে পারবে। শুধু তাই নয়, অনেকের ধারণা শুধু ভারত , পাকিস্তান ও বাংলাদেশেই মাজহাব। মজার বিষয় হচ্ছে এখানে, যখন এই অ্যাপ এর মাধ্যমে জানতে পারবেন আরব দেশগুলো মাজহাবপন্থী। এই অ্যাপে সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে মাজহাব সম্পর্কে এবং ব্যবহার করা হয়েছে সহজ সরল আমাদের মাতৃভাষা।আর তুলে ধরা হয়েছে আরবি দেশের বাস্তব রুপ ও বিভিন্ন আরবি শায়খদের লেকচার। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি শায়খের মাজহাব ভিত্তিক আলোচনা দেখে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক

দান করুন। হে রব্বে কারীম, তুমি শায়খ আব্দুর কারীম আল মাদানী হাফিজাহুল্লাহর খেদমতকে কবুল করুন। শায়খকে হায়াতে তৈয়্যবা ও উনার ইলমে বরকত দান করুন ও আমাকে ক্ষমা করুন আমীন।

"আমি ঐ দিনই হবো চিরসুখী ও খুশি

যে দিন আল্লাহ আমাকে মাফ করেছে বলে ঘোষণা দিবেন"

নুর-আলম রুমী

২

হুট করে যখন বিদ্যুৎ আসে তখন প্রথম দিকে চোখটা পুরোপুরি খোলা রাখা যায় না। অন্ধকার থেকে দ্বীনের আলোতে আসা একজন ব্যক্তি প্রথমদিকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হোন। যার মধ্যে অন্যতম হলো "মাজহাব" বিষয়ক সমস্যা।

আমরা সবাই জানি আমাদের ইসলামের ভিত্তি হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। এই কথাটি যখন মাথায় আসে তখন মস্তিষ্ক কাউন্টার এট্যাক করে বলে, "তাহলে মাজবাহ কেন? কী দরকার তা মানার? কুরআন হাদীস তো আছেই। তা থেকে দেখে আমল করতেই তো হয়।" এই ভ্রান্তির বেড়াজালে দ্বীনে ফিরে আসা কোনো ব্যক্তি পড়েনি তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

প্রশ্ন যখন আমাদের মাথায় ঘুরপাক খায় তখম আমরা একজন শায়েখের সান্নিধ্য হই, তিনি হলেন "শায়েখ গুগল"। বলা হয়ে থাকে, "পৃথিবীর এমন কিছু নেই যা গুগলে নেই।" তো, সেখানে একজন দ্বীনে ফিরে আসা ব্যক্তি অনুসন্ধান করে অনেক কিছুই পেয়ে যান।

এতে মনে করেন, "কী দরকার সামনাসামনি কোনো উস্তাযের সুহবতে/সান্নিধ্যে যেতে।" অথচ গুগল থেকে পাওয়া প্রশ্নের উত্তর যে কোন সাইট/সোর্স থেকে নেয়া হচ্ছে সেটার খবরও একজন রাখেন না, যা পান লুফে নেন। অনেকে এসব গুগল সার্চ করে মাজহাব বিদ্বেষী কোনো লেখা পড়ে মাজহাব পুরোপুরি ছেড়ে দেন আবার অনেকে সন্তুষ্টজনক উত্তর না পেয়ে তা মানা নিয়ে সংশয়ে ভূগেন, একটা পর্যায়ে তিনিও মাজহাব পুরোপুরি ছেড়ে দেন।

এবার আসি একটু নিজের কথায়। মুসলিম পরিবারে বড় হয়েও আমি বড় হয়েছি ৮/১০টা সাধারণ মুসলিম পরিবারের সদস্যদের মতনই। একটা সময়ে দ্বীনের দিকে খুব বেশী ঝুঁকে যাই আলহামদুলিল্লাহ। তখন নিয়ত করি, "না, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে এভাবে না অতিবাহিত করে আল্লাহর ইবাদত করে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে।" দ্বীনে ফেরার পরেই যে ঝামেলার মুখোমুখি হলাম তা হলো "মাজহাব" মানা নিয়ে। আমার কোনো কিছু নিয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে আমি আমার ছোট বেলার উস্তাযের কাছে যেতাম। এবারও তা করলাম।

আমার উস্তাযের কাছে গিয়ে আমি মাজহাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। আমি বারবার বললাম, "আমার জানা দরকার, কেন আমি মানবো? কী কারণে? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কি বলে গিয়েছেন?" আরও অনেক প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। তিনি চেষ্টা করেছিলেন বুঝাতে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন, উত্তরগুলো সন্তুষ্টজনক ছিল না।

এরমধ্যে আরও কিছু দ্বীনদার বন্ধু মিলে গেল। তাদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতাম। ভালোই সময় কাটতো। একদিন তারা আমাকে বললো, "এসব মাজহাব মেনে কী হবে? কুরআন সুন্নাহই তো আমাদের ভিত্তি।" কথাটা যৌক্তিক লাগলো, "তাই তো।" কিন্তু আমি তখন বললাম, "কিন্তু অনেক ফিকহী বিষয় আছে যেগুলো ইমামরা ব্যাখ্যা করেছেন। মাজহাব তো আমাকে সহজ করে দিয়েছে এবং আমি সহজেই ফতোয়া পেয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো মাজহাব মেনে আসছেন।"

অবাক করা বিষয় হলো, তাদের একজন আমাকে বলেছিল, "বাপ-দাদা ভুল করলে তুমিও ভুল করবে নাকি?" কথার মারপেঁচে আমি বন্দি। একদিনে না আমি পারছিলাম কিছু বলতে না পারছিলাম সইতে। তারা আরও বললো যে, "ইমামদের কাছে সব ইলম পৌঁছাইনি। তারা বলেছেন তাদের সাংঘর্ষিক কিছু হলে সেটা বাদ দিয়ে সহীহ হাদীস মেনে নিতে।" এসব কথা শোনার পরে বললাম, "আচ্ছা ঠিকাছে, আমি আরও দেখি এই নিয়ে।"

বাসায় আসার পর আবারও অনুসন্ধান করতে লাগলাম। "কেন? কেন? কেনই বা আমাকে মাজহাব মানতে হবে?" আমিও অসহায় হয়ে খোঁজতে লাগলাম গুগলে, ফেইসবুকে, ইউটিউবে, বই আছে কী না সেই খোঁজে। আফসোসের ব্যাপার হলো, "একটা জায়গায়ও আমি সন্তুষ্টজনক উত্তর পাইনি!"

পরে আমি মনকে বুঝালাম যে, "অবশ্যই ইমামরা ভুল না। অবশ্যই তারা এমনি এমনি ফতোয়া দিতেন না। আর যদি ইমামরা এমনই সাধারণ কেউ হতেন তাইলে সারা দুনিয়ার মানুষ তাদের ফিকহকে অনুসরণ করতো না যুগ যুগ ধরে।" এটায় ফিক্সড থাকলাম যে, "না! মাজহাব আমি মানবই। কেউ না মানলে তার বিষয়।" এরপর থেকে এই কেন্দ্রীক কথাবার্তা এড়িয়ে চলতাম।

পাঠক! এই হলো আমার জীবনের ক্ষুদ্র একটি সমস্যার কথা। আমার যদি এই হয়, আপনি কি মনে করেন না দ্বীনে ফিরে আসা লাখ লাখ মানুষ এই সমস্যায় পড়ে কূল পাচ্ছে না? অবশ্যই "হ্যাঁ!"

আব্দুল কারিম। নামটা অনেক সুন্দর, মাশাল্লাহ! জন্মেছেন সিলেটের কোনো এক গ্রামীণ অঞ্চলে। ছোট থেকেই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন। তারপর তিনি পাড়ি জমান মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র তথা "মদিনায়" অবস্থিত "মদিনা মুনাওয়্যারা বিশ্ববিদ্যালয়" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি শরিয়াহ

বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছেন।

ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয় ২০২০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। সুদর্শন, সুঠাম দেহের অধিকারী তিনি। ভাইয়ের সাথে যতক্ষণ কথা বলেছিলাম মনে হয়েছিল আমি শান্ত কোনো মহাসাগরের পানির সাথে কথা বলছি। কথা মধ্যে থাকা কোমলতার ছোঁয়ায় আমি যেন গলে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলাম অনেক, আলহামদুলিল্লাহ সেদিন আমি সব উত্তর সন্তুষ্টজনক পেয়েছিলাম।

ইদানীং আব্দুল কারিম ভাই মাজহাব নিয়ে লিখালিখি করছেন তাঁর ফেইসবুক আইডিতে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ হানাফি মাজহাবের অনুসারী। দুঃখের বিষয় হলো মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া জেনারেল শিক্ষিত কারোরই মাজহাব নিয়ে তেমন জানাশোনা নেই। বড়দের কাছে থেকে জেনে জেনে আমরা পালন করে আসছি। দ্বীনের পথে এসে অনেকে আবার মাজহাব ছেড়ে দিয়েছেন। যারা মাজহাব মানেন তাঁদের কাছে ছুঁড়ে দেন প্রশ্নের উপর প্রশ্ন কিংবা কোটেশন করা কোনো উক্তি এই সেই। যা শুনে একজন মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়।

আব্দুল কারিম ভাই, হানাফি ফিকহ নিয়ে লিখালিখি করছেন। বেশ ভালোই আলোচনা হচ্ছে এ নিয়ে। আচ্ছা প্রশ্ন আসতে পারে, "ভাই কি অন্যদেরকে নিচে নামানোর জন্য লিখছেন?" উত্তর হচ্ছে "না, একদম না।" তিনি বরং লিখালিখি করছেন হানাফি মাজহাবের অনুসারীদের জন্য। যাতে তাদের মনে কোনো ধরণের সংশয় কিংবা প্রশ্ন থাকলে সেগুলোর উত্তর পেয়ে নির্বিঘ্নে মাজহাব অনুসরণ করতে পারে। মাজহাব কিংবা ইমাম আবু হানিফার (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে মিথ্যা কথাগুলোও তিনি রদ/রিফিউট করেছেন।

এই দায়িত্বটুকু নেয়া উচিত ছিল বিজ্ঞ আলেমদের কিন্তু দুঃখের কথা হলো যে, এই বিষয়ে লিখালিখি করছেন একজন তালিবুল ইলম যার লেখার কারণে আজকে অনেকে মাজহাব নিয়ে ক্লিয়ার হতে পারছে। তাঁর মনে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে। তাঁর মনের সংশয় দূর হচ্ছে। এসব লেখা পড়ে একজন মানুষের কাছে মাজহাব সম্পর্কে ধারণা সচ্ছ পানির মতন হয়ে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ।

আব্দুল কারিম ভাই, লেখার সময়ে শুধু নিজের কথা ব্যক্ত করে শেষ করেননি বরং তিনি উম্মাহর বিজ্ঞ বড় বড় আলেম-উলামাদের "কথা" টেনে নিয়ে এসে রেফারেন্সসহ দেখিয়েছেন যে, "কেন মাজহাব মানতে হবে এবং কার জন্য মানা জরুরী। তিনি ফিকহ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করেছেন। করেছেন ফিকহের মূলনীতি নিয়েও।" ভাইয়ের লেখা পড়ে অনেকে মনে করেছেন লেখাগুলো তাদের বিরুদ্ধে, আসলে সেটা নয়। তিনি তাঁর মতন করে লিখে দলিল/প্রমাণসহ পেশ করে যাচ্ছেন, যা অনবদ্য।

ভাইয়ের লেখাগুলো অনেককে দিয়েছি পড়তে। তাঁদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, "আব্দুল কারিম ভাইয়ের লেখা পড়ে কেমন উপকৃত হলেন?" সারসংক্ষেপে সব উত্তর পেয়েছি এটাই যে, "আলহামদুলিল্লাহ! সব ক্লিয়ার হচ্ছি।"

আব্দুল কারিম ভাইয়ের লেখাগুলোর প্রশংসা না করলেই নয়। উনার লেখাগুলো থেকে আমরা যে পরিমাণ উপকৃত হচ্ছি তা বলে বোঝানো যাবে না। ভাইয়ের মাজহাব কেন্দ্রিক লেখাগুলো নিয়ে এপ্স আসছে শুনে পুলকিত হয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি যে, "আব্দুল কারিম ভাইয়ের দ্বারা উম্মাহর যেন আরও বড় বড় কাজে খেদমত করান, আমীন।"

সর্বশেষে এটাই বলবো, ভাইয়ের লেখাগুলো পড়ুন ঠান্ডা মাথায়, ব্যালেন্স রেখে। আপনি যদি মাজহাবী কেউ হন তাহলে লেখাগুলো নিজের উন্নতির জন্য পড়ুন আর যদি মাজহাব না মানা কেউ হোন তাহলে লেখাগুলো ওপেন মাইন্ড নিয়ে পড়ুন, যাচাই করুন।

মুসলিম উম্মাহ এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, যেখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে এক হয়ে কাজ করার কথা ছিল সেখানে আমরা অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মরছি। আল্লাহ যেন আমদেরকে এক হওয়ার তৌফিক দেন এবং সঠিক ও কল্যাণকর ইলম দান করেন, আমীন।

"আল্লাহুম্মাগফীরলী "

- ওয়াহিদুল হাদী

ফ্রান্স প্রবাসী

মাযহাব কি ?

মাযহাব একটি আরবি শব্দ । এটি একটি আরবী পরিভাষা (Terminology) ,যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে - School of thought । মাযহাব বিষয়ে জানতে হলে প্রথমত আমাদেরকে তার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ জানতে হবে।

মাযহাব এর শাব্দিক অর্থ –

মাযহাব শব্দটি আরবি ذهب ،يذهب ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে । যার ব্যবহৃত একাধিক অর্থ রয়েছে , তন্মধ্যে উল্লেখ্য -

১ – চলা , অতিক্রম করা ।(১)

মাযহাব এর পারিভাষিক অর্থ –

১ – ইমাম হামায়ী রাহিমাহুমাল্লাহ বলেন –

" মাযহাব হচ্ছে, শারিয়তের এমন কিছু ইজতেহাদি, ফুরুয়ী (শাখাগত) হুকুম-আহকামের নাম, যা মুজতাহিদ ইমাম দলিলে যান্নি বা অকাট্যভাবে অপ্রমাণিত দলিল থেকে সংগ্রহ করেছেন "। (৩)

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে আমরা দু'টি বিষয় বুঝলাম –

ক - ইমামগণ শরিয়তের ফুরুয়ি তথা শাখাগত বিষয়ে ইজতেহাদ বা গবেষণা করেছেন। মৌলিক কোন বিষয়ে নয় । অর্থাৎ সর্বসম্মত ফারজ ও ওয়াজিব বিধান ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা নয় , যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত; বরং অধিকাংশই সুন্নাহ, নাফল কিংবা মুস্তাহাব ইত্যাদি নিয়ে ।

খ - ইমামগণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কোন বিষয়ে ইজতেহাদ করেন নাই , বরং এমন বিষয়ে করেছেন, যা শরিয়তে অকাট্যভাবে প্রমাণিত কিংবা সুস্পষ্ট নয় ।

(১) لسان العرب لابن منظور

(৩)1/30 غمز عيون البصائر لحموي

মাযহাব কেন ?

Details

মাযহাব এর সংজ্ঞা বুঝার পর আমাদের জানা প্রয়োজন যে, কোরআন-হাদীস থাকতে মাযহাবের প্রয়োজন কি ?

উত্তর হলো , মাযহাব এর সংজ্ঞায় আমরা আলোচনা করেছি যে, মাযহাব মূলত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কিংবা সুস্পষ্ট নয়- এমন শাখাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে । এখন জানা দরকার, সেই শাখাগত বিষয়গুলো কি? আর এটা পরিষ্কার হলে কোরআন-হাদীস থাকতে মাজহাবের প্রয়োজনীয়তা কি বা কতটুকু, তা বুঝে আসবে।

বিষয়টি একটা মাসআলা ও আমার বাস্তব ঘঠনার মাধ্যমে তুলে ধরছি।

মদীনাতুর রাসূলে থাকাকালীন সময়ে গ্রীষ্মের ভরদুপুর পড়ন্ত বিকেলে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের চারপাশে সারিবদ্ধ খেজুর গাছের নিচে বসে সূরা নূরের বঙ্গানুবাদ পড়তেছিলাম। শারীয়াতের বিভিন্ন মাসাইল সমৃদ্ধ এই সূরা পাঠ ও হৃদয়াঙ্গম চমৎকার লাগে। একবার পড়ে দেখবেন, ভালো না লেগে উপায় নাই !

যাহোক, সূরা নূরের বঙ্গানুবাদ পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে নিচের আয়াতে এসে থমকে গেলাম। মোটেও সামনে আগাতে পারলাম না –

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

সূরা আন-নূর ,আয়াত নং - ৩

বঙ্গানুবাদ - *"ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে"।*

বঙ্গানুবাদ পড়ে বড় আশ্চর্য হলাম ! মাথায় দু'টি প্রশ্ন ঘুরপাক করছিল-

১. একজন জিনাকারী আরেকজন জিনাকারিনীকে আল্লাহ তা'লা বিবাহ করার কথা বলছেন। কিন্তু বিষয়টা কেমন দাঁড়ায় ? কারণ, কে জিনাকারী আর কে পুতপবিত্র, তা বুঝব কি করে ?

২. একজন জিনাকারীকে মুশরিক বিয়ে করার কথা বলছেন।

অথচ আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে মুশরিকদের সাথে বিবাহ নিষেধ করেছেন - যেমন,

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

অর্থাৎ "যতক্ষণ না ঈমান আনবে, ততক্ষন মুশরিকদের বিবাহ করা যাবে না"। সূরা আল-বাকারা ,আয়াত নং - ২২১

বড্ড বিপাকে পড়লাম ! এক আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুশরিকদের সাথে বিবাহের কথা বলছেন, অপর আয়াতে নিষেধাজ্ঞার কথা! কী ব্যাপার !

মনে তখন ভাবনা এলো,

শুধু বাংলা অনুবাদ দিয়ে কোরআনের সবকিছু বুঝা আমার জন্য সম্ভব না। এই কোরআন বুঝতে শত শত তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। হাজারো হাদিসে কোরআনের ব্যাখ্যা রয়েছে। তাই নিছক বাংলা পড়ে কোরআন পূর্ণাঙ্গ বুঝা আমার পক্ষে সম্ভব না।

ভাবলাম,তাফসিরে ইবনে কাসীরের সহযোগিতা নেই। তাফসির বের করতেই দেখি ইবনে কাসীর রাঃ বলেছেন –

قال عبد الله بن عباس : **ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع**

টাস্কিত খেলাম ! সারাজীবন পড়ে আসলাম, نكاح এর অর্থ বিবাহ, এবার জানতে পারলাম নিকাহ এর অপর অর্থ جماع তথা সঙ্গম করা !

যাহোক, সাহাবা রাঃ এর তাফসীর এটা ; না মেনে উপায় নাই। তাহলে এবার আয়াতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হলো –

'একজন জিনাকারী অপর জিনাকারিনী মহিলার সাথে খারাপ কাজ করবে অথবা কোন মুশরিকের সাথে। কোন ভালো-সালেহ বান্দা এই কাজ করতে পারে না'।

মোটামুটি একটা হৃদয়াঙ্গমে পৌছলাম। তবে আরো কতো বিষয় মনে ঘুরপাক করছে। কিন্তু কোথায় বা কি পড়লে এর উত্তর পাবো, তা বুঝতে পারছিলাম না।

এরপর মনে প্রশ্ন জাগলো -

আচ্ছা ধরে নিলাম, নিকাহ দ্বারা সঙ্গম করা উদ্দেশ্য। তবে একজন জিনাকারী ও জিনাকারীনীর বিবাহের হুকুম কি হবে ?

তাফসিরে ইবনে কাসীরে উপরোক্ত আয়াতের সব ব্যাখ্যা পড়লাম। সম্পূর্ণ সমাধান পেলাম না। ভাবলাম, কোরআনেও স্পষ্ট পেলাম না। হাদিসেও পেলাম না। কারণ হাদিসে থাকলে ইবনে কাসীর রাহঃ সাধারণত উল্লেখ করে থাকেন। এতেও পেলাম না। তাহলে বাকি শুধু ফিকাহ এর কিতাবাদী !

খেজুর বাগান থেকে দৌঁড়ে রুমে আসলাম। টেবিলের উপর এলোপাতাড়ি রেখে দেওয়া ফিকাহ'র কিতাবসমূহ থেকে 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' হাতে নিলাম !

বিবাহ অধ্যায় বের করলাম। এক একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে উপরোক্ত মাসালাটি খুঁজতে লাগলাম। এক পর্যায়ে দেখতে পেলাম লেখা -

ما حكم نكاح الزاني / الزانية ؟

একজন জিনাকারী / জিনাকারিনীর বিবাহের হুকুম কী ?

অতঃপর মাসআলাটির সমাধান পেয়ে খুবই খুশী হলাম। তবে মাসালাটি এতে দেখতে সহজ বোধ হলেও কোরআনের বাহ্যিক বর্ণনায় অনেক জটিল !

মূল খোলাসা হলো এভাবে -

একজন সৎ ও পবিত্র লোক কখনো কোন জিনাকারী মহিলাকে বিবাহ করা বিশুদ্ধ হবে না। যেহেতু আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন - জিনাকারী অপর জিনাকারিনী ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে না। তবে ওই মহিলা / পুরুষ যদি খালেসভাবে আল্লাহর কাছে তাওবা করে নেয়, তবে তার সাথে বিবাহ শাদী জায়েয আছে। কেননা,আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

‘একজন তওবাকারী খালেস তাওবা করলে এমন হয়ে যায়, যেন তার কোন গুনাহই নাই’। ইবনে মাজাহ ,৪২৫০

হাদিসের ভাষ্য মতে জিনাকারী/জিনাকারিনী তাওবা করে নিলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। ফলে সে অন্যান্য লোকের মতো সালেহ ও পবিত্র হয়ে যায়। অতএব, জিনাকারি/জিনাকারিনী যদি তাওবা করে নেয়, তাহলে তাদের সাথে বিবাহ শাদী বৈধ। আর এই মতটা ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ সহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের।

চিন্তা করুন,

মুজতাহিদীনে কেরাম একটা কঠিন মাসালাকে কতইনা সহজ করে সমাধান দিয়েছেন। আর যেই সমাধানটা দিয়েছেন , সেটাই হচ্ছে মাজহাব । তাহলে আপনারা অবশ্যই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে , কেন মাজহাব এসেছে বা কোরআন-হাদিস থাকা সত্ত্বেও কেন মাযহাব এর আবিস্কার হয়েছে।

আরো একটা বিষয় দেখুন, কুরআন-হাদীসের অধিকাংশ বিধানগুলোর স্তর তথা কোনটা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ বা মুবাহ অথবা হারাম, মাকরুহ ইত্যাদির বিবরণ কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। মাযহাবের ইমামগণ গবেষণা করে এগুলো নিধারণ করে সুস্পষ্ট করেছেন।

মোদ্দাকথায় , যে সব বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোরআন-হাদিসের বর্ণনা নাই কিংবা স্পষ্ট বর্ণনা নাই ,সেসব বিষয়ে মুজতাহিদীনে কেরামের গবেষণালব্ধ সমাধানকেই মাযহাব বলে।

অথচ, আমাদের সমাজে কিছু ভাই আছেন ; যারা বলে থাকেন, কোরআন-হাদিস থাকতে মাযহাব কেন ? প্রিয় ভাই, কোরআন-হাদিসের যেসব বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা আছে, সেগুলোর জন্য মূলত মাযহাব আসে নাই। যেসব বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত আছে , সেগুলাতে ইমামদের ইত্তেফাক বা ঐক্যমত রয়েছে। মাযহাব তো এসেছে মূলত -

১ - অস্পষ্ট বিষয়কে স্পষ্ট করতে ।

২ - পারস্পরিক বৈপরীত্য বিষয়ে সমাধান করতে ।

৩ - কোনটি খাস (নির্দিষ্ট), কোনটি আম (অনির্দিষ্ট) বর্ণনা দিতে ।

৪ - কোনটি রহিত আর কোনটি বহাল, তা বর্ণনা দিতে ।

৫ - নতুন উদ্ভাবনী সকল মাসালার সমাধান দিতে ।

৬ - ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কোরআন-হাদিসের আলোকে একটা মূলনীতি প্রণয়ন করতে ।

৭ - উম্মাহর একতা ও ঐক্য ধরে রাখতে । অথাৎ কোরআন-হাদিসের অনুসরণের নামে যে কেউ বিভিন্ন মতামত প্রদান করে বিশৃংখল অবস্থা তৈরী করতে না পারে।

অনেকে না বুঝে মনে করেন, মাযহাব মানে কোরআন ও হাদিসের মতো তৃতীয় একটা বিষয় । এটা একটা অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা। শরীয়তের মৌলিক ও প্রধান উৎস হচ্ছে - কোরআন ও হাদিস। মাযহাব কেবল কোরআন ও হাদিস অনুসরণের সঠিক পথ ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। এছাড়া অন্য কিছু না।

মাজহাব এর হুকুম কি ?

৩

এমন প্রশ্নের ঐক্যবদ্ধ উত্তর হচ্ছে - যে শরীয়তের বিষয়ে মুজতাহিদ নয় ; তাঁর জন্য মাযহাব মানা ওয়াজীব। উল্লেখ্যঃ মুজতাহিদ হচ্ছেন , যিনি কোরান-হাদিসের অকাট্য প্রমাণিত নয় ; এমন বিষয়ে নিজ থেকে মাসালা-মাসাইল বের করতে পারেন বা যিনি শারীয়তের সকল বিষয়ে জ্ঞাত রয়েছেন ।

মাযহাব মানা কি ? প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে যে, শারীয়াতের মুকাল্লাফ ব্যক্তি দু'শ্রেণীতে বিভক্ত -

১. যারা নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা কোরান-হাদিসের মানদন্ডে শারীয়ায় পন্ডিত্ব লাভ করে অস্পষ্ট / অমিমাংসিত বিষয়ে গবেষণা / ইজতেহাদ করার যোগ্যতা রাখেন।

২. যারা উপরোক্ত পর্যায় তথা ইজতেহাদের গুণে পৌঁছাতে পারেন নাই, তারা কোন না কোন মুজতাহিদ ইমামের ছাত্র/ অনুসরণকারী বা মুকাল্লীদ হিসেবে চলবেন।

কিছু দ্বীনি ভাই বলেন , মাযহাব মানা যাবে না। কারণ, কোরান-হাদিসে সরাসরি মাযহাব মানার কোন নির্দেশিকা নাই। মাযহাব মানার কোন তাগিদ নাই !

ভালো ! বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরাম অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করলেও অনেক দ্বীনি ভাইয়ের দাবী - কোরান হাদিসে সরাসরি কোন নির্দেশ না থাকায় মাযহাব মানা যাবে না। আর এ পর্যন্তই বিবাদ রয়ে গেলো।

মাযহাব মানা ওয়াজীব ---- এই উত্তরের স্বপক্ষে অনেক পরোক্ষ প্রমাণাদি কোরান-হাদিস থেকে সাব্যস্ত হলেও আমাদের কিছু ভাইদের সন্তুষ্টি হয় না। তাদের অনেকেই দাবী করেন যে, ফরজ/ওয়াজীব এগুলো হয়তো আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত হতে হবে, নতুবা রাসূল সাঃ কর্তৃক !

বড় অদ্ভুত বিষয় !

কোরান ও হাদিসের বাহিরা তারা কোন আদেশ-নিষেধ মানবে না। কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায় - যেসব বিষয়ে কোরান-হাদিসে আদেশ বা নিষেধ সরাসরি আসে নাই বা উল্লেখ হয় নাই (যেমন: সমসাময়িক অনেক মাসালা) , সে বিষয়ে তাদের বক্তব্য কি হবে ?

তন্মধ্যে, একটা মাস'আলা বলি।

আরবী ভাষা শিক্ষা করা কি ?

নিঃসন্দেহে মাজহাবী / লা -মাজহাবী সবাই বলেন , ওয়াজীব। কারণ কি ? বা দলীল কী ?

যাইহোক, আমি উত্তর না দিয়ে 'আরবী ভাষা শিক্ষার্জন করা ওয়াজীব' এর পক্ষে ইবনে তাইমিয়া রাঃ যে দলীল পেশ করেন, সেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি -

'শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাঃ এর মতে, আরবি ভাষা শিক্ষার্জন করা ওয়াজীব। তিনি দলিল আলোচনায় বলেন, যেহেতু হাদিসের আলোকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। আর দ্বীনি জ্ঞান যেহেতু আরবী ভাষা শিক্ষার্জন ছাড়া সম্ভব না, তাই আরবী ভাষা শেখাটাও ফরজ মতান্তরে ওয়াজীব'। কেননা, একটা উসূল বা মূলনীতি হলো -

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

অর্থাৎ, যে কাজ ছাড়া ওয়াজীব পরিপূর্ণ হয় না, সেই কাজটাও ওয়াজীব হয়ে যায়।

অর্থাৎ, আরবী ভাষা শিক্ষা ছাড়া যেহেতু দ্বীনি শিক্ষার্জন সম্ভব না। তাই আরবী ভাষাটাও শেখা ওয়াজীব। সূত্র - ভূমিকা , রাওজাতুন নাজির ওয়াজুন্নাতুল মানাজীর, ১৫

এবং اقتضاء الصراط المستقيم و 14 ص

আমরা ইবনে তাইমিয়া রাঃ এর দলীল থেকে স্পষ্টত দু'টি বিষয় বুঝলাম -

১. আরবী ভাষা শিক্ষা করা ওয়াজীব। এটা সরাসরি কোরান-হাদিসে বর্ণিত নয়। তবে কিয়াসের (যুক্তি) আলোকে ওয়াজীব।

২. কোরান-হাদিসে বর্ণনা ছাড়াও কোন কিছু ওয়াজীব হতে পারে। যেমন , আরবি ভাষাটা শিক্ষার্জন করা ।

এবার আসি মূল আলোচনায় -

আমি মূলেই বলেছি, মাযহাব মানা ওয়াজীব --- এই উত্তরের স্বপক্ষে কোরান-হাদিসের অসংখ্য ব্যাখ্যা থাকলেও অনেকের কাছে স্পষ্ট হয় না। তাই আমি চাই, এই বিষয়ে সেই উসূল বা মূলনীতির আলোকে বুঝিয়ে দেই, যেই মূলনীতির আলোকে আরবী ভাষা শেখাটাও ওয়াজীব সাব্যস্ত হয়েছিল ; বস্তুত এটা কোরান-হাদিসে সরাসরি আসে নাই।

আমরা বলি -

প্রসিদ্ধ চার মাযহাব থেকে কোন একটি মাযহাব মানা ওয়াজীব। কারণ,

১ – কোর'আনের এক আয়াতের সাথে অপর আয়াতের বাহ্যত বিরোধ ,

২ – কোর'আনের নাসেখ-মানসূখ (হুকুম রহিত) ,

৩ – কোর'আন-হাদিসের বাহ্যিক তা'আরুজ বা বৈপরীত্য,

৪ - সহীহ/ জঈফ হাদিস নির্ণয় ,

৫ - সম্ভাবনাময় বা কোর'আন-হাদিসে অবর্ণিত সকল মাসালার সমাধান নিয়ে অস্পষ্টতা।

উপরোক্ত বিষয়াবলী ছাড়াও অসংখ্য হেতু রয়েছে, যার কারণে একজন সাধারণ মানুষ কখনো একা একা কোর'আন-হাদিস থেকে সরাসরি মাসালা ইস্তেনবাত বা আবিস্কার করে আমল করতে পারেন না। তারজন্য প্রয়োজন, কোন না কোন সু-শৃঙখল পথ (মাযহাব) বা নীতিমালা অনুসরণ করা , যার আলোকে তিনি সহীহ-সুন্নাহ মোতাবেক আমল বা ইবাদত করবেন।

আর যেহেতু একজন সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সরাসরি কোরান-হাদিস থেকে আমল করা কঠিন বা অসাধ্য, সে'ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন না কোন সু-শৃঙ্খল মতে বা পথে চলতেই হবে। আর সেটাকেই বলে মাযহাব এর অনুসরণ বা যে কোন স্বীকৃত মতানুসারে চলা।

অতএব, যেহেতু নিজের ইজতেহাদি অক্ষমতা বা দূর্বলতার কারণে সহীহ সুন্নাহের আমলের ক্ষেত্রে মাযহাবের সাহায্য নিতেই হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি , সহীহ সুন্নাহের উপর আমল করা যেমন ওয়াজীব ; তেমনি মাযহাবের পথ ধরাটাও ওয়াজীব। কেননা, বাস্তবতার আলোকে বলা যায় -

নির্ভেজাল ও নিরংকুশ সহীহ সুন্নাহের উপর আমল করতে হলে আপনাকে মাযহাবের কোন না কোন মাসলাক মেনে নিতেই হবে। কারণ, এটা ছাড়া আপনি বিশুদ্ধ ও কোন বিষয়ে মিমাংশে পৌঁছতে পারবেন না। যেমনি শারীয়তের উসূল বা মূলনীতি রয়েছে -

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

অর্থাৎ, যে কাজ ছাড়া ওয়াজীব পরিপূর্ণ হয় না, সেই কাজটাও ওয়াজীব হয়ে যায়।

অর্থাৎ, মাযহাব ছাড়া যেহেতু সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য সম্ভব না, তাই সহীহ সুন্নাহ এর উপর আমল করা যেমন ওয়াজীব ; তেমনি বিশেষ প্রয়োজনে কখনো মাজহাব মানা ওয়াজীব ।

কেননা , মহান আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোর'আনে স্পষ্ট বলতাছেন –

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও'। -সূরা আন নহল : আয়াত ৪৩।

আর আমরা তো অতি সাধারণ মানুষ । আমাদের সালাফগণ তো মাযহাব এর অনুসরণ করে গিয়েছেন । বস্তুত , তারা মোহাদ্দিস ,মুফতী ও মুফাসসির ছিলেন ।

সৌদি আরবের সুনামধন্য মুফতী ও প্রখ্যাত আলেম শায়খ সালেহ আল-ফাওযান হাফিজাহুল্লাহ বলেন -

" হাদিসের বড় বড় ইমামগণও মাজহাব অনুসারী ছিলেন। শায়খ উদাহরণস্বরুপ বলেন -

১. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও ইবনুল কাইয়ুম রাহ. হাম্বলী অনুসারী ছিলেন।

২. ইমাম নাবাবী রাহ. ও ইবনে হাজার আসকালানি রাহ. শাফেয়ী অনুসারী ছিলেন।

৩. ইমাম তাহাবী রাহ. হানাফী অনুসারী ছিলেন।

৪. ইমাম ইবনি আব্দিল বার রাহ. মালেকি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

তারপর শায়খ বলেন -

" চার মাজহবের কোন এক মাজহাবের অনুসারী হওয়া মানে পথভ্রষ্টতা নয় যে, তাকে তিরস্কার করা হবে। বরং, যিনি মুজতাহিদে মুতলাক্ব হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না ; অথচ গ্রহণযোগ্য ফকিহদের কথা থেকে বের হয়ে যান, তাহলে তাকে পথভ্রষ্ট ও বিচ্ছিন্নবাদী হিসেবে গণ্য করা হবে "।

সূত্র - শায়খ এর গ্রন্থ ' ইয়ানাতুল মুসতাফিদ বিশারহে কিতাবিত তাওহিদ', ১২ নং পৃষ্ঠা।

সুবহানাল্লাহ !

শায়খ হাফি. এর কথা থেকে বেশ কিছু বিষয় ক্লিয়ার হলাম -

১. যে কোন এক মাযহাব অনুসরণ করা দোষণীয় নয়

২. হাদিসের ইমামগণ ও মাযহাব অনুসরণ করতেন

৩. আরব আলেমদের দৃষ্টিতে মাযহাব অনুসরণ বৈধ

৪. যিনি মাযহাব অনুসরণ করবেন, তাকে কোন ক্রমেই পথভ্রষ্ট বা সঠিক নয় - এমনটা বলা যাবে না।

হাইয়াকুমুল্লাহু জামি'আন

মাযহাব চারটা কেন ?

Details

সে অনেক কথা !

মাযহাব চারটা হবে কেন ? ইতিহাসে আরোও তো মাজহাব ছিলো, তবে এই চার মাযহাবকে মানতেই হবে কেন ? চার মাযহাব এসে ইসলামকে চারভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। মাযহাবের মতানৈক্যর কারণে ইসলামের পতন হয়েছে। বাগদাদের পতন হয়েছে। এরকম কিছু প্রশ্ন আপনারা কি শুনতে পান ?

জ্বী, হ্যাঁ ! হয়তো আপনাদের অনেকেই ইতোমধ্যে এই প্রশ্নের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছেন । অনেকেই হয়তো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সদুত্তরের অভাবে নিরুত্তর হয়ে আছেন। তাই ভাবলাম, বিষয়টি নিয়ে কিছু লিখার দরকার। আল্লাহ তাওফীক দাতা !

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান !

বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য লেখাটিকে দু'টি প্রশ্নে ভাগ করে নিচ্ছি। এতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে , ইনশাআল্লাহ !

১. মাযহাব কেন আসলো ?

২. অনেক মাযহাব থেকে চার মাযহাব কেন ?

প্রথম প্রশ্ন -

মাযহাব কেন ?

উত্তর -

আমরা জানি যে, আহকামুশ শারীয়া বা শারীয়াতের বিধি-নিষেধ দু'প্রকার -

১. স্পষ্ট আহকাম

২. অস্পষ্ট আহকাম

শারীয়াতের যে সকল বিষয়াদী একদম স্পষ্ট রয়েছে, সে'সব বিষয়ে মাযহাবের কোন বিতর্ক নাই। অপর কথায় বলা যায় যে, ইসলামের মৌলিক বিষয়ে মাযহাবের কোন বিতর্ক নাই। যেমন ধরুনঃ নামাজের হুকুম ফরজ , রোজার হুকুম ফরজ ইত্যাদি ।

শারীয়তের এমন কিছু বিষয় আছে, যা কোর'আন-হাদিসে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য এসেছে। অপর কথায় বলা যায় যে, শারীয়তের ফুরুয়ী মাসালায় অস্পষ্টতা থাকার কারণে মতানৈক্য হয়েছে।

যেসব ফুরুয়ী বা শারীয়তের শাখাগত বিষয়ে অস্পষ্টতা এসেছে, সেসব বিষয়ে ইসলামের যুগ শ্রেষ্ঠ ইমামগণ নিজস্ব যোগ্যতার বলে গবেষণা করেছেন। আর সেই গবেষণার ফলাফল একাধিক এসেছে বিধায় মাজহাব বা একাধীক মতবাদ এসেছে।

যেমন ধরুনঃ আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোর'আনে সূরায়ে বাক্কারার ২২৯ নং আয়াতে বলেন -

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'লা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দতের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে আয়াতে 'কুরু' শব্দটা অস্পষ্ট । এই 'কুরু' শব্দ দ্বারা হায়েজ উদ্দেশ্য নাকি তুহুর উদ্দেশ্য, তা ক্লিয়ার না। যার কারণে, মাজহাবের ইমামগণ গবেষণা করে একটা ফলাফল বের করেছেন। আর এই ফলাফলের ভিন্নতার নামই হলো মাজহাব।

মোদ্দাকথাঃ সংক্ষেপে আমরা জানতে পারলাম দু'টা বিষয় -

১. শারীয়াতের মৌলিক কোন বিষয়ে মাযহাবের ইমামদের মতানৈক্য নাই। বরং ফুরুয়ী তথা শাখাগত বিষয়ে মতবেদ রয়েছে ।

২. শারীয়তের স্পষ্ট কোন বিষয় বর্ণনার জন্য মাজহাব তৈরী হয় নাই। বরং, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয় বর্ণনার জন্য মাযহাব বা মতানৈক্য এসেছে।

৩ – অস্পষ্ট বিষয়ে গবেষণার একাধিক ফল হিসেবে একাধিক মাযহাব এসেছে ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন -

অনেক মাযহাব থেকে চার মাযহাব কেন হলো ?

উত্তর -

এ কথা চির সত্য যে, সাহাবা ও কিবার (বড়) তাবেয়ী পরবর্তী যুগ থেকে অনেক মুজতাহিদ ইমামের গবেষণা থেকে মাজহাব আবিস্কৃত হয়েছিলো বা তারা ইমাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এমন শতাধীক মুজতাহিদ ইমামের নাম পাওয়া যায়, যারা নিজস্ব যোগ্যতায় ইজতেহাদ দ্বারা শারীয়াতের অনেক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাধান দিয়ে গেছেন। তবে পরবর্তীতে তাদের মতবাদকে মাজহাব হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

এর অনেক কারণ আছে। তবে মৌলিক কয়েকটি কারণ আমি এখানে উল্লেখ করছি -

১. কোন মাযহাব তখনই স্বীকৃতি পাওয়ার কথা, যখন কোন মাযহাবে ইসলামের শুরু-শেষ সকল সম্ভাবনাময় সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবে পূর্ণাঙ্গ সকল বিষয় ফুটে আসে নাই। যার ফলে, ইতিহাসে কেবল প্রসিদ্ধ চার মাযহাবই স্বীকৃতি পায়। অন্য কোন মাযহাব স্বীকৃতি পায় নাই।

২. মাযহাব এর জন্য অতীব প্রয়োজনীয় হলো উসূল বা মূলনীতি থাকা। কারণ, ভবিষ্যতে কোন নতুন বিষয়ে সমাধান দিতে হলে উসূল বা মূলনীতি এর প্রয়োজন হয় । আমরা দেখতে পাই, চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন ইমামের বা মাযহাবের

কোন মূলনীতি নাই। যার কারণে চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব স্বীকৃতি পায় নাই।

৩. মাযহাব আমাদের পর্যন্ত কোন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে পৌঁছে নাই। বরং, মাযহাবের ইমামগণ ইজতেহাদ করেছেন। তাদের গবেষণা প্রতিটা যুগে মুসলিম মনীষাগণ সংরক্ষণ করেছেন। ফলে আমাদের কাছে যথাসুন্দরে এই চার মাযহাব পৌঁছেছে। চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব সেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে নাই। ফলে চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব স্বীকৃতি পায় নাই।

৪. ইসলামের স্বীকৃত চার মাযহাবের ইমামগণের হাজার হাজার ছাত্র ছিলেন। যারা মাযহাবকে প্রচার-প্রসারে কাজ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবেও মাযহাব স্বীকৃতি পেয়েছিল। আব্বাসী যুগে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালিত হতো। অন্যান্য মাহাব সেভাবে হয়নি, বিধায় চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাব স্বীকৃতি পায় নাই।

৫. স্বীকৃত চার মাযহাবের বই-পুস্তক আমাদের কাছে যেভাবে স্বতন্ত্র এসেছে, সেভাবে অন্যান্য কোন মাযহাবের বইপত্র আসে নাই। বিধায় চার মাযহাব ছাড়া অন্যান্য কোন মাযহাব এককভাবে অনুসরণীয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় নাই।

মোদ্দাকথা, বলতে গেলে আরো অনেক কথা আছে। তবে সবচেয়ে গুরুতর বাস্তব কথা হলো, এটা আল্লাহ তা'লারই একটা ইচ্ছা যা নিয়ামত হিসেবে উম্মাহের উপর আরপিত রয়েছে। নতুবা, তেরো শত বছর আগের ইলম এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে অক্ষুণ্ণ থাকা মোটেও স্বাভাবিক বিষয় না। আল্লাহ তা'লার

কাছে অক্ষুণ্ণ থাকা মোটেও স্বাভাবিক বিষয় না। আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ না থাকলে এসব মাযহাব আরো অনেক আগেই দুনিয়া থেকে মুছে যেতো। কিন্তু, আল্লাহ তালা যুগে যুগে এমন মানুষ তৈরী করেছেন, যারা মাযহাবের পর্যালোচনাকে বুকে ধারণ করেছিলেন বিধায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। যা চার মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাজহাবের বা মতবাদের ক্ষেত্রে ঘটে নাই।

আর এই চার মাযহাবের উপর আলিম-উলামার ইজমা রয়েছে। ইবনে নুজাইম আল-মিসরী (৯৭০) রাহ, বলেন –

" চার মাযহাবের শক্ত প্রতিষ্টা, প্রচার-প্রসার ও অধিকতর অনুসারী হওয়ার কারণে এই চার মাযহাবের বিপরীত কোন কিছুর আমল না করার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে"।

সূত্র – আল-আশবাহ ওয়ান্নাজাইর , ৯২

একজন ভাই একদিন এমন এক জিজ্ঞেস করে বসলেন, চার মাজহাবই যে হক্ক বা যে কোন একটা অনুসরণ হক্ক তার প্রমাণ কী ?

ভয়াবহ প্রশ্ন ! কিংকর্তব্যবিমুঢ় ছিলাম। কি বলবো, এলোপাথাড়ি ভাবনার শেষ বললাম -

প্রিয় ভাই,

দেখুন - কোন বাতিল পন্থা দীর্ঘস্থায়ী লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক বাতিলের পরে হক্ক নিয়ে আসেন আর

এই হক্ব আসার সাথে সাথেই বাতিল পরাভূত হয় !

মহান আল্লাহ তা'লা পবিত্র কোর'আনের সূরায়ে বনী ইসরাইলে বলেন -

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

অনুবাদ -

সত্য সমাগত ; মিথ্যা বিতাড়িত । বনী ইসরাইল ৮১

প্রিয় ভাই,

মাজহাব তো আজ থেকে বারো শত (১৩০০) বছর পূর্বে যাত্রা শুরু করেছে। প্রত্যেক যুগে যুগে আল্লাহ তা'লা বিশেষ কিছু মানুষ প্রেরণ করেছেন, যারা এই ইলমের বুঝা বহন করেছেন। ফলে, আমাদের পর্যন্ত এই মাজহাব পৌঁছেছে !

মাজহাব বাতিল হলে দীর্ঘ তেরোশত বছরের মধ্যে কোন না কোন সময় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু, আল্লাহ তা'লা তার বিশেষ অনুগ্রহে এই মাজহাবকে বুলন্দ করে রেখেছেন। যুগে যুগে মুজতাহিদ আলিম তৈরী করেছেন, যারা ইসলামের জন্য এই মাজহাবের জ্ঞান অক্ষুণ্ন রেখেছেন। যুগে যুগে মানুষ তৈরী করেছেন, যারা এই মাজহাব অনুসরণ করে গিয়েছেন।

আরো বললাম,

সম্মানীত ভাই আমার, এই মাজহাব বাতিল হলে আল্লাহ তা'লার ওয়াদানুযায়ী এতোদিনে অপর আরেকটি সত্য এসে বিলুপ্ত করে দিতো। কিন্তু, যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তা'লা হেফাজত করে রেখেছেন। প্রতিটা যুগে বরং বাতিল এসে মাজহাবকে আক্রমণ করেছে। আল্লাহ তা'লা বাতিলকে বিতাড়িত করে মাজহাবকে স-সম্মানে উম্মাহের কাছে মর্যাদাপূর্ণ রেখেছেন।

লাকাল হামদু ইয়া আল্লাহ !

এ থেকে প্রমাণিত হয় মাজহাব কখনো বাতিল হতে পারে না, আর বাতিল কখনো উম্মাহের মাঝে এতো লম্বা সময় আহলে হক্কের কাছে স্থায়ী হতে পারে না। আমি ইনশাআল্লাহ, ছুম্মা ইনশা আল্লাহ বলতে পারি - মাজহাব হক্ব প্রতিষ্ঠিত !

সর্বশেষ ঐ ভাইকে দিলে দরদ নিয়ে আরো কিছু কথা বললাম -

চার মাযহাবের কোন ইমাম তাদের জীবদ্দশায় হয়তো জানতেনই না যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে সর্বযুগে বিশ্বব্যাপি কবুল করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহের উপর রহম করুন; তিনি বলেন – (উনার মাকুলাহ হিসেবে শ্রুত)

'দ্বীনের যে কাজ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হবে, সেটা (কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপকারের জন্য) বাকি থাকবে; আর যেটা অন্য উদ্দেশ্যে হবে, তা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে'।

ما كان لله يبقي، وما كان لغير الله يزول.ويدل عليه عموم قوله تعالي:
{فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

অনুবাদ -

দ্বীনের যে কাজ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হবে, সেটা (কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপকারের জন্য) বাকি থাকবে; আর যেটা অন্য উদ্দেশ্যে হবে, তা কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

অতঃপর, দলিল হিসেবে ইমাম মালিক রাহ. কোরানে কারীমের সূরায়ে রা'দ এর একটা আয়াত পাঠ করেন,যার বঙ্গানুবাদ হলো -

"এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন"। বনী ইসরাইল ৮১

চার মাযহাবের বিশ্বজনীন আবেদন এবং গ্রহণযোগ্যতা এর প্রচার প্রসার এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ এক রহমত, ইনশা আল্লাহ। সাহাবাদের জীবন্ত নমুনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মুজতাহিদদের মক্কবুল এই খেদমতকে যারা ভ্রান্ত প্রমাণে মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তাদের জন্য আক্ষেপ এবং দোয়া করা ছাড়া কিছুই করার নেই।

একনাগাড়ে এই কথাগুলো দিলে দরদ নিয়ে বলছিলাম আর প্রশ্নকারী ভাই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নিচু করে শুনছিলেন। আমার কথা শেষ হলে খানিকটা মাথা উঁচু করে বললেন –

আলহামদুলিল্লাহ ,

আমিও উঁচু বাক্যে বললাম – আলহামদুলিল্লাহ !

আহসানাল্লাহু ইলাইকুম !

একই সাথে চার মাযহাব মানা যাবে কি?

Details

অনেক ভাই আছেন, যারা খিয়ার ফিল মাযহাব বা মন চাহিদা নির্ভর - যখন যে মাযহাব ইচ্ছা ; সেটাই মানেন। অর্থাৎ, যে মাযহাবের মাস'আলাটা নিজের অবস্থার অনূকূলে হয়, তখন সে মাযহাবের মাস'আলাকেই গ্রহণ করেন।

তাদের কারো কারো ভাষ্য মতে, তারা মূলত চার মাযহাব মানার দাবী করে বলেন, আমি চার মাযহাবের যখন যেটা শক্তিশালী হবে, তখন সেটাই মানব ।

আবার, অনেকেই বলে থাকেন - চার মাযহাব সত্য। তাহলে যে এক সাথে চার মাযহাব বা যখন যেটা ইচ্ছা, সেটা মানলে অসুবিধা কোথায় ? চার মাযহাবই তো সত্যই !

স্পেশালি, আমি নিজে এই প্রশ্নের অনেক সম্মুখীন হয়েছি। যারা প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের সবাইকে জাস্ট বলেছিলাম - প্রত্যেক মাজহাবের মূলনীতি ও মাস'আলা বর্ণনার প্যাটার্ন ভিন্ন। আপনি একাধিক মাজহাব একই সঙ্গে অনুসরণ করতে গেলে অনেক সময় আমল নিয়ে বিপাকে পরতে হবে বা আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ ও কখনো হতে পারে।

এই লেখায় সেটাই বুঝাতে চাইবো যে, এক সাথে দু'মাজহাব বা সুবিধাজনক মাস'আলা অনুসরণ করলে কিভাবে আমল নষ্ট হয়ে যায় -

ধরুন, আলোচনাটা হোক হানাফী ও শাফেয়ী মাজহাবদ্বয়ের ভিন্ন দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে -

শুরুতেই দু'টা মাসআ'লা উল্লেখ করে নেই -

১. কারো শরীর থেকে রক্ত বের হলে ওজু ভঙ্গ হবে কি না ___ হানাফী মাজহাবের মতে ওজু ভেঙ্গে যাবে। শাফেয়ী মাজহাবের মতে ওজু ভঙ্গ হবে না।

২. কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ যদি গাইরে মাহরাম মহিলাকে পর্দা ছাড়া স্পর্শ করে তাহলে তার ওজু ভঙ্গ হবে কি না ___ হানাফী মাজহাব মতে ওজু ভঙ্গ হবে না। শাফেয়ী মাজহাব মতে ওজু ভঙ্গ হবে।

এবার ধরুন,

একজন সুবিধাজনক ব্যক্তি, যিনি সবসময় চার মাজহাব থেকে সহজ ও অনুকূলে মতের উপর আমল করতে চান। উনার যদি শীতের দিনে কখনো গায়ে থেকে রক্ত বের হয়, তাহলে তিনি সুবিধাজনক হিসেবে শাফেয়ী মাজহাবের মত গ্রহণ করে বলবেন __ আমার ওজু ভঙ্গ হয় নাই। এ ক্ষেত্রে হানাফী মাজহাব অনুসরণ করবেন না, কারণ হানাফী মত গ্রহণ করলে শীতের দিনে ওজু পূণরায় করতে হবে!

উনি পরক্ষণেই ভুলে কিংবা যেভাবে হোক - পর্দা ছাড়া কোন গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করলেন। এবার চিন্তা করলেন যে, এতে ওজু ভঙ্গ হয়ে গেলো কি না? চিন্তা করে দেখলেন, হানাফী মাজহাব মতে তো এমতাবস্থায় ওজু ভঙ্গ হবে না। তাই হানাফী মত গ্রহণ করলেন এবংশাফেয়ী মত পরিত্যাগ করলেন। কারণ, শাফেয়ী মত গ্রহণ করলে তাঁকে পূণরায় ওজু করতে

হবে।

লোকটি প্রথম মাস'আলা তথা রক্ত ঝরার ইস্যুতে শাফেয়ী মত গ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় মাস'আলা তথা গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করার ইস্যুতে হানাফী মত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, দু'টা পৃথক মাস'আলায় দু'টা ভিন্ন মাজহাব থেকে নিজের সুবিধার মতটা গ্রহণ করেছেন। ফলে উনার আর ওজু করতে হয়নি। রক্ত ঝরা এবং গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করা সত্ত্বেও নতুন ওজু না করে এমতাবস্থায় নামাজ আদায় করলেন।

নামাজ আদায় করে উনার স্মরণে এলো যে, নামাজ তো পড়ে নিলাম। তবে এবার দু'জন হুজুরকে জিজ্ঞেস করে নেই - আমার নামাজ হলো কি না ?

১ - প্রথমে চলে গেলেন হানাফী মাজহাবে দীক্ষিত একজন মুফতির কাছে, গিয়ে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা দিলেন -

মুফতি সাহেব ফতোয়া দিলেন - আপনার নামাজ হয় নাই। কারণ, শরীর থেকে রক্ত ঝরলে ওজু ভঙ্গে হয়ে যায়। আপনার ওজু নামাজের পূর্বেই ভঙ্গ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি নতুন ওজু করেন নাই। ফলে, আপনি ওজুবিহীন নামাজ আদায় করেছেন। আর ওজুবিহীন নামাজ কখনো হয় না।

হানাফী মুফতির কাছে নিরাশ হয়ে চলে গেলেন -

২ - শাফেয়ী মাজহাবে দীক্ষিত ও পান্ডিত্বপূর্ণ একজন মুফতি সাহেবের কাছে৷ গিয়ে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা দিলেন -

শাফেয়ী মাজহাবের মুফতী ফতোয়া দিলেন - আপনার নামাজ হয় নাই। কারণ, আপনি ওজু অবস্থায় গাইরে মাহরাম মহিলাকে স্পর্শ করেছেন৷ আর এই স্পর্শের কারণে আপনার ওজু ভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু, আপনি নামাজের পূর্বে নতুন ওজু করেন নাই। আর ওজু ছাড়া নামাজ কখনো হয় না।

কি এক অবস্থা ! উভয়টি মানতে গিয়ে কারো দৃষ্টিতেই নামাজ হলো না । যদিও এটা একটা উদাহরণ ; তথাপি এক সাথে একাধিক মাজহাব অনুসরণের শেষ পরিণতি প্রায় এমনটি হয়ে থাকে।

যাহোক প্রিয় পাঠক ,

আলোচিত বিষয়টি দলিল-আদিল্লাহ সহ পেশ করলে অনেক লম্বা লেখার দরকার। তাই অতি সংক্ষেপে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করলাম। আশাকরি, সুবিধাজনক বা যখন যে মাজহাব ইচ্ছা ; সে মাজহাব মানার চেষ্টা করবেন না৷ মাজহাব মানলে একটা মাজহাবকে দলিলের ভিত্তিতে গ্রহন করবেন । মাজহাব মানার নামে নতুন আরেকটা পথ - খেয়ার ফীল মাজহাব বা মাজহাবে স্বেচ্ছাচারীতা আবিস্কার করবেন না৷

আর মন চাহিদা মাজহাব মানা সালাফগণ হারাম ফতোয়া দিয়েছেন । শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لايجوز باتفاق الائمة ونظير هذا ان يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار اذا كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت اذا كان مشتريا فان هذا لايجوز بالاجماع...لان ذالك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الاهواء.

অর্থঃ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হলে তারা সেই ইমামের অনুসরণ করে যিনি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী বিষয়টি নাজায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। আবার স্বার্থের বিপরীত হলে সেই একই ব্যক্তিবর্গ এমন ইমামের অনুসরণ করেন যিনি বিষয়টি জায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। প্রবৃত্তির এমন লাগামহীন গোলামী সকল ইমামের মতেই নাজায়িয ও অবৈধ। এ জাতীয় বিষয়ের একটি উদাহরণ হল, নিজে প্রতিবেশী ও দাবীদার হলে প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে 'ক্রয়ে অগ্রগন্যতার হক' বৈধ বলা আর নিজে ক্রেতা হলে প্রতিবেশীর জন্য তা অবৈধ বলা। এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি বিষয়ে স্বার্থের অনুকূল মাযহাব অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ইজমা তথা সকলের ঐক্যমতে বৈধ নয়। কারণ এটা দ্বীন নিয়ে খেলতামাশার পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী হারাম-হালাল নির্দিষ্ট করণের পথ খুলে দেয়। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ৩২/১০০-১০১)

নির্ধারিত কোন এক মাজহাব অনুসরণ এর প্রচলন অনেক প্রাচীন ও মুতাকাদ্দিমীন উলামা থেকে প্রমাণিত। এসব আলোচনা কোন আহলে ইলমের কাছে গোপন নয়।

শুধু কি তাই ? পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বিশেষত শায়খ বিবেচনায় অনেক মোহাদ্দিসগণ নির্ধারিত এক মাজহাব থেকে অন্য এক নির্ধারিত মাজহাবে পরিবর্তিত হওয়ার বর্ণনা আছে।

যেমন ধরুন -

১. ইমাম তাহাবী রাহ. শাফেয়ী মাজহাব থেকে হানাফী মাজহাবে পরিবর্তিত হোন।

২. ইমাম ইবনু দাকীক রাহ. মালেকি মাজহাব থেকে শাফেয়ী মাজহাবে পরিবর্তিত হোন।

৩. ইমাম আবু ছাওর রাহ. হানাফী মাজহাব থেকে শাফেয়ী মাজহাবে পরিবর্তিত হোন।

৪. ইমাম ইবনে ফারিস রাহ. শাফেয়ী থেকে মালেকি মাজহাবে পরিবর্তিত হোন।

৫. ইমাম ইবনুদ দাহহান রাহ. হাম্বলী মাজহাব থেকে হানাফী মাজহাবে পরিবর্তিত হোন।

৬. ইমাম আবু হাইয়ান রাহ. জাহিরী মাজহাব থেকে শাফেয়ী মাজহাবে পরিবর্তিত হোন।

সূত্র - ফায়জুল কাদীর, ১/২১১

শাফেয়ী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ইমাম সুয়িতী রাহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ' জাযিলুল মাওয়াহিব ফি ইখতিলাফিল মাজাহিব ' গ্রন্থে এমন অনেক সালাফদের নাম উল্লেখ করেন, যারা অন্যান্য মাজহাব থেকে শাফেয়ী মাজহাবে পরিবর্তিত হোন। একইভাবে, শায়খ জাকারীয়া রাহ. তার অনবদ্য গ্রন্থ ' লামিউদ দারারী শরহে বুখারীতে' অনেক মুহাদ্দিস ও ইমামের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা অন্যান্য মাজহাব থেকে হানাফী মাজহাবে পরিবর্তিত হোন।

সূত্র - আল-ই'তিমাদ ফি তাওদীহিল ইকতিসাদ, ১২০

নির্ধারিত হক্বপন্থি কোন মাজহাব এর অনুসরণ করা দোষনীয় কিছু নয়। বরং, নফসের খাহেশাত কিংবা দ্বীনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারীতা থেকে বাঁচা যায়। এজন্য শায়খ উছাইমীন রা. বলেন -

'কোন মাজহাবে সম্পৃক্ততা থাকার ব্যাপারে মানুষ তিন প্রকার। এক. যারা নির্ধারিত কোন এক মাজহাব অনুসরণ করবে এই ধারণায় যে, এটা ইখতেলাফী মাসালায় বিশুদ্ধতার সবচেয়ে নিকটবর্তী রয়েছে।... '

সূত্র - মাজমু'উ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইলিহি ২৬/২৮৫

আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে সালাফদের পথের উপর চলার তাওফীক দান করুক – আমীন ।

কোর'আন-হাদিস থাকতে মাযহাব কেন ?

Details

আমি আগাগোড়া একজন ফিকহুশ শারীয়া'র ছাত্র। অন্য কথায় বলা যায়, শারীয়াতের মাসালা-মাসাইল নিয়ে পড়াশোনা করা ও ইসলামের প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের তুলনামূলক আলোচনা করাই আমার স্টাডি কনসার্ন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় চান্স পাওয়া মাত্রই এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ জাগে। অবশেষ, আল্লাহর রহমতে সেই সুযোগ পেয়ে যাই।

শিরোনাম দেখেই অনেকে অলরেডি বুঝতে পেরেছেন যে , এটা একট খুব কমন প্রশ্ন , যা অনেকেই করে থাকেন । তাই সকলের উত্তরটি ভালো করে জানা থাকা জরুরী । শুরুতেই অনুরোধ করবো যে, পুরা লেখাটি আদ্যপ্রান্ত পড়বেন। আল্লাহ তা'লা আপনাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুক !

কোর'আন হাদিস থাকা সত্ত্বেও মাজহাব কেন (?) __ এ জন্য যে, আমরা শারীয়তের মাসালা-মাসাইল নিয়ে স্টাডি করতে গিয়ে অসংখ্য কোরান-হাদিসের নাস বা মূল পেসেজ পাওয়া যায় , যা থেকে সরাসরি বোধগম্য করা বা মাসালা বের করা সকলের পক্ষে সম্ভব না।

কোরানের এমন অনেক আয়াত পাই , যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন এর সক্ষমতা সকলের নাই। বাধ্য হয়ে কোন এক মুফাসসিরের ব্যাখ্যা পড়তে হয়। রাসূল সাঃ এর এমন অনেক হাদিস পাই , যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন এর সক্ষমতা সবার নাই। তাই বাধ্য হয়ে কোন এক মুহাদ্দিসের ব্যাখ্যা জানতে হয়।

কোরান-হাদিসের অসংখ্য মূল পেসেজ পাই, যা থেকে সরাসরি শারীয়তের মাসালা উদঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তাই বাধ্য হয়ে আমরা কোন এক মাজহাবের সম্মানীত ইমামের ইজতেহাদ বা গবেষণাকে তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হয়।

মাজহাব কেন ? এই প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলাম যে, কোরানের এমন কিছু বিষয় আছে, যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন করা যায় না। বাধ্য হয়ে মাজহাবের ইমামদের তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হয়।

চলমান প্রবন্ধে এ কথা বুঝিয়ে দিব (ইনশাআল্লাহ) যে , এমন অনেক হাদিস ও আছে, যা থেকে সরাসরি মাসালা উদঘাটন বা আমল করা যায় না। বরং, বাধ্য হয়ে কোন এক মাজহাবের ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ করতে হয়।

তাহলে চলুন এখনি বিষয়টা বুঝে নেই।

শারীয়াতের বেচাকেনা অধ্যায়ে একটা প্রসিদ্ধ মাসালা আছে, তার আরবী নাম হলো - التسعير (আত্তাস'ঈর)।

এটার শাব্দিক অর্থ - মূল্য নির্ধারণ করা।

পারিভাষিক অর্থ - সরকার বা বাজার কমিটি কর্তৃক কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া এবং এটার উপর বেচা-কেনার জন্য উভয়পক্ষকে (ক্রেতা-বিক্রেতা) বাধ্য করা।

মাসালা হলো - শারীয়াতে এভাবে পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া জাইজ কি না ?

উত্তর - এই মাসালার সরাসরি কোর'আনে কারীমে কোন কিছু পাওয়া যায় না । তবে হাদীস শরীফে স্পষ্ট একটা নাস পাওয়া যায়। তা হলো -

قالَ النَّاسُ يا رسولَ اللَّهِ ، غلا السِّعرُ فسعِّر لَنا ، قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ اللَّهَ هوَ المسعِّرُ القابضُ الباسطُ الرَّازقُ ، وإنِّي لأرجو أن ألقَى اللَّهَ وليسَ أحدٌ منكُم يطالبُني بمَظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ

মূল সারসংক্ষেপ হলো -

একদা মদীনায় অনেক পণ্যের দাম বেড়ে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাঃ কে বললেন - হে আল্লাহর রাসূল ! দাম বেড়ে গিয়েছে। আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তিরমিজি,১৩১৪

রাসূল সাঃ জবাবে বললেন - আল্লাহ তা'লা কেবল দাম নির্ধারণ কর্তা, তিঁনিই রিজিক গ্রহীতা, তিঁনিই রিজিক প্রশস্তদাতা এবং রিজিকদাতা।

মোদ্দাকথা, সাহাবাদের অনুরোধে রাসূল সাঃ পণ্যের দাম বৃদ্ধিতে অনাগ্রহ দেখিয়ে বললেন, আল্লাহ তা'লা রিজিক দাতা, তিনিই রিজিক ফেরতগ্রহীতা, তাই তিনিই সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ কর্তা।

হাদিসের মানঃ সহীহ

যাইহোক, হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য ও ফতোয়া হচ্ছে -- সরকার বা বাজার কর্তৃক কোন পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া না-জাইজ। যেহেতু রাসূল সাঃ তা করেন নাই। পণ্যের মুল্য বৃদ্ধির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'লা রাখেন ।

অপরদিকে সরাসরি হাদিসের উপর আমল করলে যে প্রশ্ন মাথায় চলে আসে। তা হলো -

১. আল্লাহ তা'লা কোথায় পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন ? চাল, ডাল, গমের দাম কতো ? কোরান-হাদিসের কোন জায়গায় উল্লেখ আছে ?

২. ওহী তো বন্ধ, নিত্যনতুন পণ্যের দাম আল্লাহ তা'লা কিভাবে জানিয়ে দিবেন ?

৩. পণ্যের দাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণ হলে ব্যবসায়ীরা নিজ থেকে দাম নির্ধারণ করে এবং উলামায়ে কেরাম তার বৈধতা দেন কেন ?

৪. আরব বা ইউরোপে বড় বড় সুপার মলে সব পন্যের দাম নির্ধারিত। তা বৈধ হয় কি করে ?

মোদ্দাকথা, সরাসরি হাদিস মানতে গেলে এমন সব হাজারো প্রশ্ন মাথায় ভনভন করবে। আমরা বিশ্বাস করি, এসব অনর্থক চিন্তা বা প্রশ্ন মাথায় প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার নাই। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ একটা হলেও উদ্দেশ্যেগত অর্থ অবশ্যই ভিন্নতা রয়েছে। যা তালাশ করলে পেয়ে যাবো ইনশা আল্লাহ।

এই হাদিসের কোন ব্যাখ্যা কোরান বা অন্য কোন হাদিসে পাওয়া যায় নাই। তাই আমরা এবার সরাসরি চলে যাবো মাজহাবের সম্মানীত ইমামদের ইজতেহাদ বা গবেষণাগারে। দেখবো, তারা এই হাদিসের কি ব্যাখ্যা দেন বা উপরোক্ত মাসালার কি ফতোয়া দিয়ে থাকেন।

হাদিসের বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা না - জাইয। কেননা, রাসূল সাঃ তা করেন নাই। ইমামদের ঐক্যমতে সরকার বা বাজার কমিটি কর্তৃক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা জাইজ।

তাহলে আপাততঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূল সাঃ এর হাদিস ও ইমামদের ফতোয়ায় বৈপরীত্য রয়েছে। নাহ, আসলে কোন বৈষম্য না। বরং, আমাদের বোধগম্যের অপ্রতুলতা। আমরা তাদের ভাষ্য দেখবো এবং তার পর বুঝতে পারবো যে, আসলেই তাদের গবেষণা হাদিস মোতাবেক ও একদম বাস্তবতার সাথে যথোপযুক্ত।

সরকার কর্তৃক পণ্যের দাম নির্ধারণ করা জাইজ কি না ___ এই প্রশ্নে ফোকাহায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধ বলেন, সম্পূর্ণ জাইজ এবং তা বর্তমানে ইসলামী শারীয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

ফোকাহাদের দাবী ও তাঁদের দলীল -

১. হাদিসের এসেছে আল্লাহ তা'লা দাম নির্ধারক __ তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'লা প্রত্যেকটা পণ্যের আলাদা আলাদা করে দাম নির্ধারণ করে দিবেন। আর এটা আল্লাহ তা'লার শানে যায় না। বরং, হাদিসের উদ্দেশ্যগত ব্যাখ্যা হচ্ছে - আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক মানুষকে পরিপক্ক আক্কল ও মেধা দিয়েছেন। অপরদিকে, সবাইকে ইনসাফ বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে মানুষ তার আকল, মেধা দ্বারা প্রত্যেক কিছুতে ইনসাফ পালন করবে। বেচা-কেনায় সম্পূর্ণ আদালত বা ন্যায়বিচার পোষণ করে। আর আল্লাহ তা'লা ন্যায়বিচারকারীদের পছন্দ করেন। কারণ, তিঁনি নিজেই ন্যায়বিচারকারী।

২. রাসূল সাঃ এর অপর একটা হাদিস হলো এবং এটা ইসলামী শারীয়ার মূলনীতিভুক্ত -

((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))

অর্থাৎ ইসলামে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া বা কাউকে ক্ষতি করার সুযোগ নাই ।

হাদিসের মানঃ হাসান

ফোকাহায়ে কেরাম বলেনঃ সরকার কর্তৃক যদি পণ্যের দাম নির্ধারণ করে না দেওয়া হয় ; তাহলে সময়-সুযোগ বুঝে কিছু অসাধু বা সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে সাধারণ জনকে কষ্টে ফেলে দিবে। যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ !

৩. সরকার কর্তৃক উল্লেখ্য পণ্যের দাম নির্ধারিত না হলে স্থান ভেদে মূল্যে ভিন্নতা থাকতে পারে। যা সম্পূর্ণ বৈষম্য ও বে-ইনসাফী। আর ইসলামে বে -ইনসাফী বা বৈষম্যের জায়গা নাই ।

ইত্যাদি সব কারণে ও উম্মাহের ব্যাপক কল্যাণ স্বার্থে (যেটাকে শারীয়ার একটা মূলনীতি ধরা হয় - عام مصلحة الناس) ইসলামের সম্মানীত চার মাজহাবের ইমামগণ সরকার বা বাজার কমিটি কর্তৃক পণ্যের দাম নির্ধারণ করাকে জাইজ বা বৈধতা দিয়েছেন । যদিও তা হাদিসের বাহ্যিকতার সাথে সাংঘর্ষিক ; কিন্তু ইসলামের মূলনীতি ও হাদিসের উদ্দেশ্যগত অর্থের সাথে সম্পূর্ণ যৌক্তিক !

ফালিল্লাহিল হামদ - পূর্ণাঙ্গ শারীয়া মানতে গিয়ে মাজহাবের অনুসরণ করে আমরা কখনো বিপকে পরি না বা কিয়ামত পর্যন্ত বিপকে পরার কোন সুযোগই নাই , ইনশা আল্লাহ। কেননা, মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণ উম্মাহের জন্য কোরান-হাদিসের আলোকে কিয়ামত অবধি সকল সমূহ সম্ভাবনাময় সমস্যার সমাধান ও তার মূলনীতি প্রণয়ন করে গিয়েছেন। যা থেকে মানুষ কোরান-হাদিসে সরাসরি কোন কিছু না পেলে, মাজহাবের মূলনীতির আলোকে সমস্যার সমাধান করতে পারবে, সুবহানাল্লাহ !

এজন্য একজন সাধারণ পাঠকের জন্য কখনো কোরান হাদিসের আক্ষরিক অর্থে আমল করা উচিৎ নয়। বরং, ফোকাহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ফিরতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমল করতে হবে।

১.

এ ব্যাপারে হাদিসের ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহ. বলেন -

الحديث مضلة إلا للفقهاء

অনুবাদ -

“ফুকাহা ব্যতীত অন্যদের (নিজ বুঝ অনুসারে) হাদীস অনুসরণ করা বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার কারণ।”

সূত্র -খুৎবাতুল কিতাবিল মুআম্মাল-আবু শামা ১/১৫১।

২.

ইমাম শাফেঈ রাহ. একজন প্রসিদ্ধ ফকিহ ও মুজতাহিদ ইমাম। একদা তিনি কিছু মুহাদ্দিসকে লক্ষ করে বলেন -

أنتم الصيادلة ونحن الأطباء

অনুবাদ -

আপনারা হলেন ফার্মেসিস্ট এবং আমরা হলাম ডাক্তার। অর্থাৎ, একজন মোহাদ্দিস জাস্ট হাদিসের মান নির্ণয় করে দিবেন আর ফকিহগণ হাদিসের আলোকে মাস'আলার বিবরণ দিয়ে থাকেন।

সূত্র -সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/২৩।

৩.

ইমাম তিরমিযী রাহ. 'মাইয়্যেতের' গোসল প্রসঙ্গ এক আলোচনায় বলেন -

وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث،

অনুবাদ -

"এমনটি ফুকাহা কেরাম বলেছেন। আর হাদীসের অর্থের ক্ষেত্রে ফকিহগণ অধিক জ্ঞাত।"

সূত্র -সুনানে তিরমিযী (৯৯০)

সম্মানিত পাঠক,

উপরের তিনটা বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হাদিসের মর্ম উদঘাটনে ফোকাহাদের দ্বারস্থ হতে হবে এবং তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমল করতে হবে।

সাধারণ কেউ সরাসরি হাদিস পাঠ করে সেই অনুসারে আমল করতে পারে না। বরং, তাকে অবশ্যই অবশ্যই ফোকাহাদের আলোচনার দিকে ফিরতে হবে। এমনটাই সালাফদের সীরাত থেকে প্রমাণিত হয়।

১.

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব রাহ. বলেন -

نظر مالك إلى العطاف بن خالد، فقال مالك: بلغني أنكم تأخذون من هذا! فقلت: بلى. فقال: ما كنا نأخذ إلا من الفقهاء.

অনুবাদ -

"ইমাম মালেক রাহ. আত্তাফ ইবনে খালেদ রাহ. কে লক্ষ করে বললেন, জানতে পারলাম তোমরা না কি (সরাসরি) হাদীস অনুসরণ কর ?

উত্তরে তিনি বললেন, জী হা ! ইমাম মালেক রাহ. তখন বললেন, আমরা ফুকাহা কেরাম রাহ. এর ব্যাখ্যা অনুসারেই হাদীস অনুসরণ করে থাকি!"

সূত্র -তারতীবুল মাদারিক ১/১৩৯

২.

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান রাহ. বলেন -

إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آيَ القرآن.

অনুবাদ -

“আমরা হাদীস ফকীহ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করতাম। এবং ফোকাহা থেকে কুরআনের আয়াত শিখার মত হাদীস শিখতাম।”

সূত্র -জামেউ বায়ানিল ইলম ২/৯৮

৩.

হাদিসের ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. প্রসঙ্গে ইয়াহয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন -

يفتي بقول أبي حنيفة

অনুবাদ -

“তিনি ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মতানুসারে ফতোয়া দিতেন।”

সূত্র - আখবারু আবি হানীফা ওয়া আসহাবুহু- কাযী ছাইমারী পৃ.১৫৫,

প্রখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান রাহ. বলেন -

لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله.

অনুবাদ -

"আল্লাহ সাক্ষী আমি মিথ্যা বলছি না আবু হানীফার চে' অধিক উত্তম মতামত বিশিষ্ট ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মত গ্রহণ করে থাকি।"

সূত্র -তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৩,

৫.

তাঁর সম্পর্কে তারই শাগরিদ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. বলেন,

كان يفتي أيضا بقول أبي حنيفة.

অনুবাদ -

"তিনিও আবু হানীফার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন।"

সূত্র -আখবারু আবি হানীফা ওয়া আসহাবুহু- কাযী ছাইমারী পৃ.১৫৫

৬.

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. (২৩৩হি.) বলেন -

القراءة عندي قراءة حمزة، والفقه فقه أبي حنيفة، وعلى هذا أدركت الناس.

অনুবাদ -

“আমি হামযা রাহ. এর পদ্ধতি অনুসারে কিরাত ও আবু হানীফার ফিকহ গ্রহণ করে থাকি। এবং লোকদেরকে এরূপ করতে দেখেছি।”

সূত্র -আখবারু আবি হানীফা ওয়া আসহাবুহু-কাযী ছাইমারী পৃ. ৮৭, তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৩

৭.

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ.। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসূফ রাহ. বলেন,

سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي حنيفة.

অনুবাদ -

“সুফিয়ান ছাওরী রাহ. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবু হানীফার সহমত পোষণ করেন।”

সূত্র -ফাযায়িলু আবি হানীফা-ইবনে আবিল আওয়াম পৃ. ১০৫

৮.

ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রাহ. (২৩৪হি.) বলেন,

سفيان الثوري كان يذهب ويفتي بفتواهم.

অনুবাদ -

" সুফিয়ান ছাওরী রাহ. আবু হানিফা রা. এর মতানুসারীদের মতানুসারে আমল করেন ও ফতোয়া প্রদান করেন।"

সূত্র -আলজারহু ওয়াততা'দীল ১/৫৮

সুবহানাল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম!

হাদিস শাস্ত্রের সিকাহ ও প্রসিদ্ধ রাবীদের কিছু কথা ও আমল আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যা থেকে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় -

১. ফিকাহ ছাড়া হাদিস বুঝা যায় না

২. হাদিসের ব্যাখ্যা মুফতি থেকে নিতে হয়

৩. মোহাদ্দিসগণ ফিকাহ অনুসরণ করতেন

৪. হাদিসের অনেক বড় বড় ও সিকাহ রাবী হানাফী অনুসারী ছিলেন।

৫. মোহাদ্দীস হলেও মাজহাব মানতেন।

শেষকথা ,

যে সব রাবীদের কারণে আপনি-আমি হাদিস পেয়েছি - ফিকাহ, মাযহাব ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের কিছু কথা নকল করেছি। এবার ভেবে দেখার বিষয় সম্পূর্ণ আপনার !

বারাকাল্লাহু ফিকুম !

নির্ধারিত কোন মাজহাব না মেনে অধিক শক্তিশালী মত মানা যাবে কি ?

Details

নির্ধারিত কোন মাজহাব না মেনে সকল মাজহাব থেকে অধিক শক্তিশালী মতটা গ্রহণ করা একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য একটা বৃথা প্রচেষ্টা ও অরণ্য রোদন বৈ কিছু না। এ নিয়ে নিচে দালিলিক আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ। শুরুতে , ভূমিকা স্বরুপ কিছু কথা বলি ।

নির্ধারিত কোন মাজহাব না নেমে সকল মাজহাব থেকে অধিক শক্তিশালী মতটা গ্রহণ করতে চাওয়া মানে একটা অসাধ্য বিষয়ে আকাঙ্খা করা । কারণ,

১. অধিক শক্তিশালী মতটা স্পষ্ট ও নির্ণয় করার মতো বিষয় হলে, চার মাজহাব আবিস্কার হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলো না। দরকার ছিলো না এতো মত-পথ তৈরী হওয়ার।

২. অধিক শক্তিশালী মতটা স্পষ্ট হলে এযাবৎ সকল শক্তিশালী মত নিয়ে একটা মাজহাব প্রণয়ন হতো। যেটার নাম হতো শক্তিশালী মাজহাব। কিন্তু, ইতিহাসে এই শক্তিশালী মাজহাব এখনো জন্ম হয় নাই।

৩. অধিক শক্তিশালী মতটা সহসা বের করার মতো হলে এই অধিক শক্তিশালী মত-সমগ্র নিয়ে ফিকহী বই রচিত হতো। কিন্তু, মতানৈক্যর উর্ধ্বে উঠে এযাবৎ নিরংকুশ এমন কোন ফিকহি বই রচনা হয় নাই।

এবার আসি মূল আলোচনায় । জ্বী, হ্যাঁ ! কথা সত্য ; তবে বাস্তবায়ন কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, তা হলো - To say is easy but to do is hard।

তার দু'টি কারণ -

১. অস্পষ্ট ও জঠিল বিষয়ে কোর'আন-হাদিসের অধীক নিকটবর্তী মতটা আবিস্কার করার জন্য তো মতানৈক্য বা মাজহাব এসেছে। তো আপনি আবার নতুন করে কি আরেকটা মাজহাব আবিষ্কার করবেন ?

২. মাজহাব সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে আলিম-উলামারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে, চার মাজহাব ছাড়া কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী বলে কোন মাজহাব তৈরী করা যায় কি না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত কেউ পারেন নাই। সুতরাং, নিশ্চিত থাকেন যে আপনিও পারবেন না।

মোদ্দাকথা, কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তীটা আমল করি ___ এ কথা মুখে বলা যতোটা সহজ ; কাজে বাস্তবায়ন এতো সহজ না। নিকটবর্তী মত নির্ধারণ নিয়েই তো এতসব মতানৈক্য হলো ; তাহলে নতুন করে আপনি আর কি মতানৈক্য তৈরী করবেন ?

একটা উদাহরণ দেখি আমরা।

ফরজ নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে সূরায়ে ফাতেহাহ পড়ার হুকুম কি ? এই ব্যাপারে কোর'আন-হাদিসে বহু আলোচনা আছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন -

" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون "

অর্থ: *আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়।*

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বক্তব্য তাফসীরে তাবারী (৯খ. ১০৩পৃ.) ও তাফসীরে ইবনে কাসীরে (২খ. ২৮পৃ.) এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে-

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " يعني في الصلاة المفروضة

অর্থ : *যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয় অর্থাৎ ফরজ নামাযে।*

হযরত ইবনে মাসঊদ রা. এর মতও তাই। তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে:

صلى ابن مسعود، فسمع أناسا يقرءون مع الامام، فلما انصرف، قال: أما آن لكم أن تفقهوا ؟ أما آن لكم أن تعقلوا ؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله

অর্থাৎ, *হযরত ইবনে মাসঊদ রা. নামায পড়ছিলেন, তখন কতিপয় লোককে ইমামের সঙ্গে কেরাত পড়তে শুনলেন। নামায শেষে তিনি বললেন: তোমাদের কি অনুধাবন করার সময় আসেনি, তোমাদের কি বোঝার সময় হয় নি? যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন।* (৯ খ. ১০৩ পৃ.)

যায়দ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া র. বলেছেন:

كانوا يقرأون خلف الإمام فنزلت : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

অর্থাৎ, *তাঁরা (সাহাবীগণ) ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন, তখন অবতীর্ণ হয়*

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন:

أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة

অর্থাৎ, *এবিষয়ে সকলেই একমত যে, উক্ত আয়াত নামায সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।* (মাসাইলে আহমদ লি আবী দাঊদ, পৃ. ৪৮)

মোদ্দাকথা, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, নামাজে ইমাম সাহেবের পিছনে কিরা'আত পড়া যাবে না।

এবার আমরা বিপরীত মতটা দেখি।

প্রসিদ্ধ হাদীস -

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

অর্থাৎ - *যে ব্যক্তি নামাজে সূরায়ে ফাতেহাহ পড়লো না, তার নামাজই হলো না।*

এটা একটা প্রসিদ্ধ হাদীস, যার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নাই। তো ভাইয়েরা, এবার চিন্তা করে দেখুন। উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণ করে যে, নামাজে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়া লাগবে না। আবার নিচের হাদিসে প্রমাণ করে যে, সূরায়ে ফাতেহাহ না পড়লে নামাজই হবে না।

এবার বলুন, এই যে কঠিন একটা পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়, যার মধ্যে সমন্বয়ে করে কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী মতটা কি আবিস্কার করা আপনার পক্ষে সম্ভব ?

প্রিয় ভাই , মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী মতটা যদি সু-স্পষ্ট পাওয়া যেতো, তাহলে তো ইসলামে চার মাজহাবের প্রয়োজনই হতো না। এতো এতো মতানৈক্যের প্রয়োজন ছিলো না ।

শেষকথা, মতানৈক্য বিষয়ে কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী একটা মত পুরাপুরি নিশ্চিত করার মতো কিছু নাই। চার মাজহাবের সকল মতই প্রায় কোর'আন-সুন্নাহের অধীক নিকটবর্তী। তাই তো আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাতে চার মাজহাবই বিশুদ্ধ ও স্বীকৃত । যে কোন একটা মানলেই চলে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

'চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব কারো পছন্দ হলে ঐ বিষয়ে আপত্তি করা অন্যের জন্য বৈধ নয়। যার কাছে শাফেঈ মাযহাব ভালো লাগে, সে মালেকী মাযহাব পছন্দ করে এমন কারো প্রতি আপত্তি করতে পারবে না। তেমনি কারো কাছে হাম্বলী মাযহাব ভালো লাগলে সে শাফেঈ মাযহাব বা অন্য কোনো মাযহাবের অনুসারীর প্রতি আপত্তি রাখতে পারবে না'।

সুত্র - মাজমুআতুল ফাতাওয়া ২০/২৯২

শেষকথা , শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এর ফতোয়া থেকে আমরা স্পষ্ট দু'টি বিষয় বুঝতে পারলাম –

১ – চার মাজহাবই হক্ক । যে কোন একটা অনুসরণ করা যাবে ।

২ – কেউ কোন এক মাজহাব মানলে , তাকে আপত্তি করা যাবে না ।

এছাড়া আমাদের অনেক ভাই দাবি করেন যে , ইমাম আবু হানিফা রাহঃ বলেছেন তো , যখন হাদিস সহীহ , সেটাই আমার মাজহাব হবে । সুতরাং , চার মাজহাবের অধিক বিশুদ্ধ মতটি গ্রহণ করলে অসুবিধা কি ?

বিষয়টি নিয়ে কিঞ্চিত আলোচনা জরুরী মনে করছি !

" হাদিস যখন সহীহ হবে; সেটাই আমার মাজহাব হবে"

এই কথাটা খুব প্রচলিত না ?

ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর কথা না ?

জ্বী, হ্যাঁ ! আমাদের দেশে এই কথাটা খুব জোরালো করে ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ এর নামে যেমন চালিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি এই কথাটার ভুল ব্যাখ্যাও করা হয়।

মানে -

এই কথাটায় দু'টা ভুল বিদ্যমান

১. কথাটা ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ এর নামে চালিয়ে দেওয়া।

২. কথাটার ভুল ব্যখ্যা দেওয়া।

১. " হাদিস যখন সহীহ হবে ; সেটাই আমার মাজহাব হবে " - বাক্যটি ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ বলেন নাই। বরং, এই কথাটা এককভাবে ইমাম শাফী রাঃ বলেছেন। অন্য কেহ এমন কথা বলেছেন ___ এমনটা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

সূত্র -আল-মাজমু' পৃষ্ঠা ৬৪

আমাদের দ্বীনি ভাইয়েরা কোন কিছু পেলে সহীহ/জঈফ/জাল ইত্যাদি যাচাই করতে বলেন, তবে এই কথাটা যে বিনা যাচাইয়ে ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর নামে চালিয়ে দেন, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন ?

২. কথাটার ভুল ব্যখ্যা করা হয়। বলা হয়ে থাকে - প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, হাদিস সহিহ হলেই সেটা আমার মাজহাব!

এটা নিতান্ত ভুল ব্যাখ্যা। বরং, ইমাম শাফী রাঃ এই কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, যখন হাদিসটা উনার মাজহাবের হাদিসের মূলনীতির আলোকে সহীহ হবে ; তখন সেটাই উনার মাজহাব সহীহ বলে গৃহীত হয়েছে / হবে। এমন ব্যাখ্যা শাফী মাজহাবের উসূলি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।

আমরা জানি যে, কোন হাদিস সহীহ /জইফ বা কোনটি জাল হাদিস অর্থাৎ উসূলুল হাদিস নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন বা গ্রন্থ রচনা করেন শাফেয়ী মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণ। ফলে, ইমাম শাফী রাহঃ থেকে এমন কথা বের হওয়া অতি স্বাভাবিক ব্যাপার !

এবার ভিন্ন একটা পয়েন্টে আলোচনা করি -

১. আমাদের ভাইয়েরা একদিকে দাবী করেন যে, কোন ইমামই মাজহাব তৈরী করে যান নি ; বরং, মাজহাব উনাদের মৃত্যুর বহু পরে আবিস্কার হয়েছে। আরো বলেন, মাজহাবের ইমামগণ উনাদের মাজহাব প্রণয়নের কথা জানেনেই না।

অপরদিকে আমাদের ভাইয়েরা বলে বেড়ান যে, মাজহাবের ইমামগণ বলেছেন - হাদিস যখন সহীহ হবে ; তখন সেটাই আমার মাজহাব হবে।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে -

ইমামগণ যদি কোন মাজহাব তৈরী নাই বা করে যান, তাহলে তারা আবার কি করে বলতে পারেন যে, হাদিস যখন সহীহ হবে ; সেটাই আমার মাজহাব হবে ??

কেননা, এই বাক্যে তো " আমার মাজহাব " অর্থাৎ উনাদের নির্ধারিত মাজহাব বলতে কিছু একটা আছে, এ কথার জানান দিচ্ছে !

আমাদের ভাইয়েরা একদিকে বলেন, মাজহাবের ইমামগণ কোন মাজহাব তৈরী করে যান নি। অপরদিকে বলেন, মাজহাবের ইমামরা বলেছেন - যখন হাদিস সহীহ হবে ; তখন সেটাই আমার মাজহাব হবে !

সর্বশেষ , আমার সম্মানীত পাঠকের জন্য একটা বক্তব্য তুলে ধরছি –

'একজন সাধারণ মুসলিম কখনো নিজে নিজে ধোকা খেয়ে যায়। সে নিজে নিজে বই-পুস্তক পাঠ করে ভাবতে থাকে, সে তো আলিম থেকেও বড় হয়ে গিয়েছে। সে এক দু'টা মাসালা পড়ে, কিংবা বই পড়ে সমাজে আলিম সেজে ভাবতে থাকে, সে কোন ক্রমেই ইলমে ও ফাহলে আলিম-উলামা থেকে কম নয়। এমনকি কখনো ভাবতে থাকে থাকে, তার বুঝ ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেকি কিংবা হাম্বলী রাহ. থেকেও কম নয়'।

وهذا كلام صاحب المنعم الشيخ موسى شاهين في بداية السنة والتشريع

এছাড়া , অনেকেই তো একটা বিষয় নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করেন যে , সকলে ইমামে বলেছেন –

" হাদিস যখন সহীহ হবে , সেটাই আমার মাযহাব"

এই একটা বাক্য নিয়ে অনেকেই নিজেকে হাদিসের ময়দানে সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করেন যে , হাদীস সহিহ হলেই সেটা মানব । কিন্তু ইমাম এই কথা কাকে বলেছেন ? বা এই কথা দ্বারা কি বুঝিয়েছেন ? তা হয়তো অনেকের অজানা ।

এই কথার উদ্দেশ্য কী ?

ইমাম নববী (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) বলেন -

وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوه من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها ، وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به.

অর্থাৎ এ কথাটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি তার মাযহাবে ইজতেহাদের স্তরে পৌঁছে গেছেন। তবে শর্ত হলো, শাফেয়ী রহ. হাদীসটি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারেন নি, বা তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি, এ ব্যাপারে তার প্রায় নিশ্চিত্র জ্ঞান থাকতে হবে। আর এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন তিনি শাফেয়ীর সকল কিতাব, তার শিষ্যগণের কিতাব ও অনুরূপ আরো কিছু অধ্যয়ন করবেন। এটি একটি কঠিন শর্ত যা খুব কম ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়।

সূত্র - আল মাজমু, ১/১০৪)

হাফেজ আবু আমর ইবনুস সালাহ (মৃত্যু ৬৪৩ হি.) বলেছেন,

وليس هذا بالهين ، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث

অর্থাৎ এ কাজ অত সহজ নয়। যে কোন ফকীহ এমনটি করতে পারেন না যে, তিনি নিজে যে হাদীসকে প্রামাণ্য জ্ঞান করবেন সে অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আমল করবেন।

সূত্র - আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী, ১/১১৮)

ওল্লাহুল মুস্তা'আন

মাযহাব পরিবর্তন করা যাবে কি?

Details

এই বিষয় খুবই গুরুত্ববহ। মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি না ? অর্থাৎ, কেউ হানাফী মাজহাবের হলে, সে কি মালেকী / শাফেয়ী বা হাম্বলী হতে পারবে ?

এই বিষয়ে আমাদের দেশে যেমন বাড়াবাড়ি আছে, তেমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথেষ্ট উপলব্ধির অভাব আছে । কেউ যদি হানাফী হয় এবং অন্য মাজহাবে পরিবর্তন হতে চায় _ তাহলে কোন আলেম বা বিশেষত হানাফী কেহ তা সাপোর্ট করেন না । বরং, চরম মাত্রায় ধমক দেন।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ! মাজহাব বিষয়ে এতো কঠোরতা কখনো কাম্য না । প্রাজ্ঞা ও সহনশীলতার সাথে মাজহাবকে ডিল করতে হবে। নতুবা, ফেতনা-ফাসাদ কখনো অন্ত পাবে না ।

যাইহোক, মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি না __ এই প্রশ্নের সোজা উত্তর হলো –

জ্বী, মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে। অর্থাৎ, আপনার হানাফী মাজহাব এর উপর ইতকান বা পরিতৃপ্তি না আসলে আপনি অন্য মাজহাব অনুসরণ করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে শারীয়াহ যেমন বাঁধা দেয় না ; তেমনি চার মাজহাবের উসূল ও মানা করে না।

দলীল –

মাজহাবের ক্রমবিকাশ হয়েছে প্রত্যেক ইমামের ছাত্রদের থেকে। আমরা ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই, এমন অসংখ্য ইমামদের ছাত্র রয়েছেন ; যারা আপন ইমামের মাজহাব ত্যাগ করে অন্য ইমামের মাজহাব গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'রানী রাঃ – মাজহাব পরিবর্তন করার ব্যাপারে ইমাম কারাফী রাঃ থেকে বর্ণনা করেন –

يجوز الانتقال من جميع المذاهب إلى بعضها بعضا

অর্থাৎ, *প্রত্যেক মাজহাবেই এক মাজহাব থেকে অন্য মাজহাব পরিবর্তন হওয়া জাইজ করেছে।*

সূত্রঃ – আল-মিজানুল কোবরা /৩৯

চার মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণের ছাত্ররা পরবর্তীতে আপন ইমামের মাজহাব পরিবর্তন করার ব্যাপারে ইমাম সুয়ুতী রাঃ বেশ কিছু আলেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন –

১. শায়খ আব্দুল আজীজ আল-খাজা'ঈ রাহঃ প্রথমে মালেকী মাজহাবের অনুসরণ করতেন। পরবর্তীতে, ইমাম শাফী রাঃ যখন বাগদাদে আগমন করেন ; তখন তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী হয়ে যান।

২. ইবরাহীম আল –বাগদাদী রাঃ প্রথমে হানাফী মাজহাবের ছিলেন। পরবর্তীতে, ইমাম শাফী রাঃ যখন বাগদাদে আগমন করলেন ; তখন তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুরাগী হয়ে যান।

৩. ইমাম তাহাবী রাঃ প্রথম দিকে শাফেয়ী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও অনুরাগী ছিলেন। পরবর্তীতে, তাহাবী রাঃ তাঁর আপন মামা ইমাম মুজনী রাঃ থেকে হানাফী মাজহাবের শিক্ষাদীক্ষা পেলে তিঁনি শাফেয়ী মাজহাব ছেড়ে হানাফী মাজহাবের ইমাম বা অনুসারী হয়ে যান।

৪. একইভাবে, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ – আল'মুজমাল এর মুসান্নীফ ইবনে ফারিস রাঃ প্রথমে শাফী মাজহাবের ছিলেন। পরবর্তীতে, তিঁনি মালেকী মাজহাবের অনুসারী হয়ে যান।

সূত্র – আল-মিজানুল কোবরা / ৪০

প্রিয় ভাইয়েরা !

মাজহাব কোন কোরান-হাদিসের সরাসরি স্পষ্ট উদ্ধৃত বিষয় না । বরং, সম্মানীত ইমামগণের ইজতেহাদী বিরাট এক ইলমি খেদমত ও বিরোধপূর্ণ কিংবা অদৃশ্য মাসালার সুবিন্যস্ত সুরাহা মাত্র । যার বিস্তার-বিকাশ সম্মানিত ইমামগণের ছাত্রদের মাধ্যমে হয়েছে।

অতএব, মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি না __ এর দলিল কোরান-হাদিস থেকে না দিয়ে যাদের দ্বারা মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথা সম্মানীত ইমামগণের ছাত্রদের মাজহাব পরিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরলাম। যা থেকে স্পষ্টত বোধগম্য হয় যে, মাজহাব পরিবর্তন করতে শারীয়া কিংবা মাজহাবের উসূলের দৃষ্টিতে কোন রকম বাঁধা নাই।

কিন্তু, আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

যারা মাজহাব পরিবর্তন করা যাবে কি না – এই প্রশ্ন বারবার করেন। আপনাদের তরে আমার দু'টি কথা –

দ্বীনি ভাই!

দেখুন – মাজহাব আমাদের পর্যন্ত বিরাট একটা দ্বীনি সেবার মাধ্যমে এসেছে। হাজার হাজার আলিম-উলামার লেখালেখি, পড়াপড়ি ও বয়ানের মাধ্যমে আমাদের উপমহাদেশে হানাফী মাজহাব এসেছে। তাই আমরা অগত্যা এই মাজহাব পেয়েছি।

উপরের আলোচনা থেকে মাজহাব পরিবর্তন এর বৈধতা প্রমাণিত হলেও এই না যে, আপনি চাইলেই মাজহাব পরিবর্তন করে নিলেই মুক্তি পেয়ে যাবেন। মাজহাব পরিবর্তন করার আগে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী আপনাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে –

আপনি যে মাজহাবের অনুসরণ করতে যাচ্ছেন, আপনার দেশে/জেলায় কিংবা এলাকায় সেই মাজহাবের –

(১) কোন আলিম আছেন কি না ?

(যাতে ঠেকে গেলে তাদের জিজ্ঞাস করতে পারেন)

(২) কোন মুফতি আছেন কি না ?

(যাতে তাদের থেকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে পারেন)

(৩) কোন মাদ্রাসা/প্রতিষ্ঠান আছে কি না ?

(যাতে আপনি শিখতে চাইলে পড়তে পারেন)

(৪) কোন বই/পুস্তক/ফতোয়ার গ্রন্থ আছে কি না ?

(যাতে নিজে নিজে স্টাডি করতে চাইলে পেতে পারেন)

প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা,

সম্মানীত কোন এক ইমামের মাজহাব পরিবর্তন করার আগে যাচাই করে নিবেন যে, উপরোক্ত চারটি বিষয় আপনার আশেপাশে এভেইলেবল কি না। নতুবা, হিতে বিপরীত কাহিনি হতে পারে। কেননা, উপরের আলোচনায় যাদের মাজহাব পরিবর্তন নিয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ; চিন্তা করে দেখুন, তাঁরা ঠিক তখনই মাজহাব পরিবর্তন করেছেন ; যখন সেই মাজহাবের কোন ইমামের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তাছাড়াও, তাঁরা সবাই মোটামুটি ইজতেহাদের পর্যায়ের ছিলেন।

মনে করুন,

আপনি হানাফী থেকে মালেকী মাজহাবে পরিবর্তন হতে চাচ্ছেন। তাহলে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে আমাদের দেশে মালেকী মাজহাবের –

১ – কোন আলিম আছেন কি না ?

২ – কোন মুফতি আছেন কি না ?

৩ – কোন প্রতিষ্ঠান আছে কি না ?

৪ – কোন ফতোয়ার বই আছে কি না ?

যদি পান, তাহলে আপনি নির্দ্বিধায় মালেকী মাজহাবে পরিবর্তন হতে পারেন। নতুবা, আপনার জন্য মহৎ ও কল্যাণ হলো সেই মাজহাবের উপর থাকা ; যেই মাজহাব আপনার দেশে প্রচলিত রয়েছে। যেই মাজহাবের আলিম-উলাম / বইপুস্তক ইত্যাদি আপনার দেশে রয়েছে। জাযাকাল্লাহ খাইরান !

ফি আমানিল্লাহ !

চার মাযহাবের স্বীকৃতি ও নির্ধারিত এক মাযহাব মানার হুকুম কি ?

Details

নির্ধারিত এক মাযহাব মানা যাবে কি ? এই ব্যাপারে অনেকের মনে সুপ্ত প্রশ্ন আছে , যা জানা থাকা খুবই আবশ্যকীয় ।তাই এ বিষয়ে পূর্বেকার আলিমদের ফাতাওয়া তুলে ধরার চেষ্টা করবো , ইনশা আল্লাহ !

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, শরীআতের মৌলিক ও স্পষ্ট বিধি-বিধান এবং আকীদাগত বিষয়ে কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু শাখাগত মাস'আলায় আব বিশেষত এমন মাস'আলা , যে সবে মতানৈক্য বা অস্পষ্টতা রয়েছে , সেসব বিষয়ে নির্ধারিত এক মাযহাব অনুসরণে কোন অসুবিধা নাই ।

আসুন , চার মাযহাবের স্বীকৃতি ও এক মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে পূর্বেকার সালাফদের মন্তব্য জেনে নেই -

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রহ. (মৃত্যু:৭২৮ হি.) চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মুজতাহিদের মাযহাব মানা যাবে কি না? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

الاجماع اليوم قدانعقد على خلاف هذا القول.

অর্থঃ এর বিপরীতে (চার মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মুজতাহিদের মাযহাব না মানার ব্যাপারে) আজ ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ২০/৫৮৪)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল, উম্মতের ঐক্যমতে বর্তমানে চার ইমামের মাযহাবই অনুসরণযোগ্য।

২. প্রখ্যাত হাদীস গবেষক ও বিশ্লেষক ইমাম যাহাবী রহ. (মৃত্যু:৭৪৮হি.) বলেন,

فيمتنع تقليد غير الاربعة في القضاء والافتاء لان المذاهب الاربعة انتشرت تحررت.

অর্থঃ মাসআলা মাসাইল সংক্রান্ত ফাতাওয়া ও আদালতের ফায়সালার ক্ষেত্রে চার ইমাম ব্যতীত অন্য কারো তাকলীদ ও অনুসরণ নিষিদ্ধ। কেননা এই চার মাযহাব পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা কিতাবাকারে সংকলিত হয়েছে। (ফয়যুল কাদীর ১/২৬৯ ও ২৮৮)

৩. ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. (মৃত্যু: ৮০৮ হি.) তার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ তারীখে ইবনে খালদুনে লিখেছেনঃ

وقد صار اهل الاسلام اليوم على تقليد هولاء الائمة الاربعة.

অর্থঃ এ যুগে ইসলামের অনুসারীগণ এই চার ইমামের একজনকে তাকলীদ (অনুসরণ) এর জন্য বরণ করে নিয়েছেন। (তারীখে ইবনে খালদুন ১/৪৭৯)

৪. বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত্যু: ৯৭০ হি.) বলেন,

وماخالف الائمة الاربعة فهو مخالف للاجماع.

অর্থঃ যে মাযহাব ও মতামত ইমাম চতুষ্টয়ের বিপরীত হবে তা মুসলিম উম্মাহর ইজমা তথা সর্ববাদী সিদ্ধান্তের বিরোধী হিসেবে বিবেচিত হবে। (আল আশবাহ-১৬৯)

৫. ভারতবর্ষের বিখ্যাত ফকীহ ও ফিকহের মূলনীতি বিশেষজ্ঞ শায়খ আহমদ মোল্লা জিয়ুন রহ. স্বীয় গ্রন্থ তাফসীরে আহমাদিয়াতে লিখেনঃ

قد وقع الاجماع على ان الاتباع انما يجوز للاربع ...وكذا لايجوز لاتباع لمن حدث مجتهدا مخالفا لهم.

অর্থঃ কেবল ইমাম চতুষ্টয়ের তাকলীদই বৈধ হবে, এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপ এদের বিপরীতে কোন নব্য মুজতাহিদের অনুসরণ বৈধ হবে না। (তাফসীরে আহমাদিয়্যা পৃ: ৩৪৬)

৬. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. (মৃত্যু: ১১৭৬ হি.) বলেন,

ان المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة اومن يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا.

অর্থঃ সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ এই চার মাযহাবের অনুসরণের বৈধতার উপর আজও পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ অর্থাৎ উম্মাহর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/২৮৬)

বন্ধুগণ! সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও কেন একই সঙ্গে সকল ইমামের তাকলীদ বৈধ হবে না বা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জনের অনুসরণ বৈধ হবে না এ ব্যাপারে তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি বিশেষের তাকলীদ প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তার সঙ্গে এটুকুও জেনে রাখুন যে, মাযহাবসমূহ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে যেমন চার মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি অনুসরণের ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তির জন্য চার মাযহাবের মধ্যে থেকে কেবল যে কোন একটিকে গ্রহণ করা বৈধ ও একাধিক মাযহাব গ্রহণ করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারেও আলিমদের মত রয়েছে।

কেননা বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে একাধিক মাযহাব মানা বাস্তবতার নিরিখেই যেমন অসম্ভব তেমনি মনের চাহিদা অনুযায়ী যখন যে মাযহাব মনে চায় অনুসরণ করাও বিচারবুদ্ধি ও যুক্তির খেলাফ। কেননা শয়তানের সহযোগী নফসে আম্মারা তথা কুপ্রবৃত্তির অধিকারী মানুষের জন্য তা হবে প্রবৃত্তিপূজার হাতিয়ার। বিষয়টি নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন উক্তির

মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন,

فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لايجوز باتفاق الائمة ونظير هذا ان يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار اذا كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت اذا كان مشتريا فان هذا لايجوز بالاجماع...لان ذالك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الاهواء.

অর্থঃ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হলে তারা সেই ইমামের অনুসরণ করে যিনি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী বিষয়টি নাজায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। আবার স্বার্থের বিপরীত হলে সেই একই ব্যক্তিবর্গ এমন ইমামের অনুসরণ করেন যিনি বিষয়টি জায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। প্রবৃত্তির এমন লাগামহীন গোলামী সকল ইমামের মতেই নাজায়িয ও অবৈধ। এ জাতীয় বিষয়ের একটি উদাহরণ হল, নিজে প্রতিবেশী ও দাবীদার হলে প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে 'ক্রয়ে অগ্রগন্যতার হক' বৈধ বলা আর নিজে ক্রেতা হলে প্রতিবেশীর জন্য তা অবৈধ বলা। এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি বিষয়ে স্বার্থের অনুকূল মাযহাব অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ইজমা তথা সকলের ঐক্যমতে বৈধ নয়। কারণ এটা দ্বীন নিয়ে খেলতামাশার পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী হারাম-হালাল নির্দিষ্ট করণের পথ খুলে দেয়। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ৩২/১০০-১০১)

২. বর্তমান বিশ্বের প্রখ্যাত ফকীহ মুহাদ্দিস আল্লামা মুফতী তকী উসমানী (হাঃ) নির্দিষ্ট এক ইমাম মানার ব্যাপার উম্মতের ঐক্যমতের কথাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

فلو ابيح لكل احد ان ينتقى من هذه الاقوال ماشاء متى شاء لادى ذلك الى اتباع الهوى دون الشريعة الغراء وبالتالي فان كل واحد من هذه المذاهب له نظام خاص يعمل في اطاره بحيث ان كثيرا من مسائله مرتبط بعضها ببعض فلو اخذ منه حكما وترك حكما اخر يرتبط به لاختل ذالك النظام وحدثت حاله من التلفيق لايقول بصحتها احد...ومن هنا دعت الحاجة الى التمذهب بمذهب معين.

অর্থঃ মনের অনুকূলে স্বাধীন মত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলে প্রবৃত্তির অনুসরণের পথই কেবল উন্মুক্ত হবে, নিখাঁদ শরী'আতের অনুসরণ হবে না।...

দ্বিতীয়তঃ মাযহাবগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, আমলের পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা যার ভিত্তিতে সেখানে আমল করা হয়। ফলে দেখা যায় অনেক মাসআলাই একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং যদি কোন একটি বিধানকে গ্রহণ করে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপর বিধানকে বর্জন করা হয় তাহলে মাযহাবের মূলনীতি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হবে এবং প্রবৃত্তি অনুসরণের পথ সৃষ্টি হবে যাকে পরিভাষায় তালফীক বলা হয়। যা বৈধ হওয়ার কথা কেউ আদৌ বলেন না।...আর এ কারণেই নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। (উসূলুল ইফতা পৃ: ৬৩-৬৪)

৩. বিখ্যাত গ্রন্থ রিয়াজুস সালেহীন প্রণেতা আল্লামা নববী রহ. (মৃত্যু: ৬৭৬ হি.) বলেন,

انه لو جاز اتباع اي مذهب شاء لافضى الى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذالك يؤدي الى انحلال ربقة التكليف..فعلى هذا يلزمه ان يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين.

অর্থঃ মনের খেয়ালখুশি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যে কোন মাযহাবের অনুসরণ বৈধ হলে তা মানুষকে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মাযহাবসমূহের সহজ সুবিধাজনক ও অনুকূল বিষয়গুলো লুটে নেয়া এবং হারাম-হালাল, ও আবশ্যকীয় ও বৈধ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মনের পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দিকে ঠেলে দিবে। আর এই মনোভাব শরয়ী বাধ্যবাধকতার লাগাম অবমুক্ত করে দিবে। সুতরাং অনুসরণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোন মাযহাব নির্বাচনে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। (আল মাজমু শরহুল মুহাযযাব। ভূমিকা অংশ ১/১২০-১২১

হাফেজে হাদীস আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন,

وعلى غير المجتهد ان يقلد مذهبا معينا.

অর্থঃ গাইরে মুজতাহিদ অর্থাৎ কুরআন হাদীস ও শরী'আতের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও সল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব অনুসরণ করে আমল করা অপরিহার্য। (ফয়যুল কাদীর ১/২৬৯)

৫. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

اعلم ان الناس كانوا في المائة الاولى والثانية غير مجتمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه وبعد المائتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين باعيانهم ...وعلى هذا ينبغي ان القياس وجوب التقليد لامام بعينه.

অর্থঃ মুসলমানগণ প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকে নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না অর্থাৎ তখন পর্যন্ত এর প্রয়োজন দেখা দেই নি। কিন্তু দ্বিতীয় শতকের পর নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাবসমূহ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।...সুতরাং নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া বুদ্ধি-বিবেচনারই দাবী। (আল ইনসাফ পৃ: ৬৮-৭০)

উপরোক্ত পাঁচটি বক্তব্যের প্রথম দুটি নির্দিষ্ট করে যে কোন একজন ইমামের মাযহাব অনুসরণের বাস্তবতা ও এ সংক্রান্ত ইজমা তুলে ধরেছে আর পরবর্তী বক্তব্যগুলো এটাকে আরও জোরদার করে তুলেছে। সুতরাং বর্তমানে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাব অনুসরণের বিকল্প নেই।

আর ৪র্থ শতাব্দির উলামায়ে কেরামের চার ইমামের যেকোন এক ইমামের মাযহাবের অনুসরণ আবশ্যক হওয়ার উপর ইজমা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এসেছে। যেমন-

আলইনসাফ-৫২, ৫৭-৫৯।

মাদারে হক-৩৪১।

ইন্তিসারুল হক বজওয়াবে মিয়ারে হক-১৫৩।

আলমুআফাকাত-৪/১৪৬

আলমাজমূ শরহুল মুহাজ্জাব-১/৯১

রাহিমাকুমুল্লাহ !

মাযহাব মানেই কি তাকলিদে শাখসি ?

Details

মাজহাব মানা কি তাকলীদে শাখসি বা ব্যক্তির অনুসরণ ? মাজহাব মানা কি কোন ব্যক্তির কথার অনুসরণ , নাকি কোর'আন-হাদিসের অনুসরণ ? এ ব্যাপারে বেশ কিছু ভুল বুঝাবুঝি আছে । বক্ষমান লেখায় চেষ্টা করবো ভুলের নিরশন করতে , ইনশা আল্লাহ !

প্রথমত –

যে কোন মাজহাব মানা কি তাকলীদে শাখসী করা ? নাহ ,এটা একটা ভুল ধারণা । অনেক মানুষে মনে করেন যে , মাজহাবের অনুসরণ মানেই সেই মাজহাবের ইমামের একক অনুসরণ করা । বস্তুত , এটা ভুল বুঝাবুঝি মাত্র । তিনটি কারণ রয়েছে –

১ – একটা মাজহাব অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে ,সে মাজহাবের সকল মুফতা বিহি মত (যে মতে ফতোয়া রয়েছে) মান্য করা । আর মুফতা বিহি মত কিন্তু সব সময় মাজহাবের ইমামের হয়ে থাকে না । বরং , মাজহাবের অন্যান্য ইমামেরও হয়ে থাকে । একটা মাজহাবে একাধিক মুজতাহিদ ইমাম থাকেন , সকলের মতই কোন না কোন মাসালায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । তাহলে একক ইমামের অনুসরণ রইল কি করে ?

২ – প্রত্যেক মাজহাবে দেখা যায় , ইমামের ছাত্রগণ দলিলের ভিত্তিতে খুদ ইমামের সাথে মতবিরোধ করেছেন ।এবং কখনো ছাত্রদের মতামতে ফতোয়া সিদ্ধ হয়ে থাকে । তাহলে একক ইমামের অনুসরণ বাকি থাকে কি করে ?

৩ – দিন যতো অগ্রসর হচ্ছে , বিভিন্ন সমসাময়িক সমস্যা আবিস্কার হচ্ছে । এসব সমস্যার শার'ঈ সমাধান দিয়ে থাকেন জীবিত বড় বড় মুফতিগণ এবং মাজহাবের অনুসারিগণ সেই মুফতিদের ফতোয়া অনুসরণ করে থাকেন । তাহলে মাজহাবে আর একক অনুসরণ বাকি রইল কোথায় ?

দ্বিতীয় –

হানাফী মাজহাব বলতে কি তাকলীদে শাখসী বা একজন ব্যক্তির অনুসরণ বুঝায় ? প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ে আলোচনা জরুরী মনে করছি ।কারণ , আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ হানাফি অনুসারী হওয়ায় , এই প্রশ্নের প্রায়ই সম্মুখীন হতে হয় ।

অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, যারা হানাফী মাজহাব অনুসরণ করেন, তারা একজন ব্যক্তি তথা ইমাম আবু হানীফা রাঃ তাকলীদ করেন।

ধারণাটি মোটেও সঠিক নয় । হানাফী মাজহাব সূচনা লগ্নে চল্লিশজন মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরামের সমন্বয়ে চয়িত হয়েছে। তারপর থেকে, মোট সাতটা পর্যায়ক্রম পার হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। প্রতিটা ক্রমে যুগের মুজাদ্দীদ,মুহাক্কীক, মুজতাহিদ ফোকাহায়ে কেরাম অনেক কিছু রদবদল ইত্যাদি করেছেন। কোরান-সুন্নাহের নিকটবর্তী বিশুদ্ধতম মতটি গ্রহণ করেছেন।

সুতরাং, হানাফী মাজহাব মানে শুধু ইমাম আবু হানীফার মাজহাব না। হানাফী মাজহাবের সূচনাতেই অসংখ্য মাসালায় ইমামে আ'জমের মতকে রহিত করে ভিন্ন মত গৃহীত হয়েছে। তারপর থেকে ইমাম আবু ইউসূফ, ইমাম মোহাম্মাদ, ইমাম জুফর, ইমাম আবুল হাসান শায়বানী, ইমাম তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ

- সহ অসংখ্য ইমামের অগণিত ইজতেহাদ বা মত হানাফী মাজহাবে অনুপ্রবেশ করেছে। যারজন্য, আমাদের মাজহাবের নাম আবু হানীফা মাজহাব না হয়ে হানাফী মাজহাব হয়েছে। অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা রাঃ থেকে সূচনা, তবে তার পরবর্তীতে অসংখ্য মুজতাহিদ ফোকাহাদের ইজতেহাদ ও গবেষণার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

অতএব, যারা বলেন হানাফীরা তাকলীদে শাখসী বা এক ব্যক্তির অনুসরণ করে, তাদের কথা ভ্রান্ত ও মিথ্যা অপবাদ। এসব কথার কোন ভিত্তি নাই। হানাফী মাজহাব মূলত যুগে যুগে শ্রেষ্ট মনীষাদের গবেষণার চূড়ান্ত ফসলের নাম। কোন একক মতামত বা গবেষণার নাম না। বিস্তারিত , আমরা হানাফি মাজহাবের অধ্যায়ে আলোচনা করবো ইনশ আল্লাহ !

আরো বিস্তারিত জানতে - মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা রাঃ বইয়ের ৬/৭/৮ পৃষ্ঠা পড়ুন। বই পড়ুন, ইতিহাস জানুন, ইনশাআল্লাহ সব সন্দেহ ও অপবাদ ধুলিমাখা হয়ে যাবে।

এছাড়া ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ,

الفقه على المذاهب الأربعة

এই কিতাবের মধ্যে হানাফি মাযহাবের মত যেখানে এসেছে, যেই মাসয়ালার ক্ষেত্রে এসেছে, সেখানেই বলা হয়েছে,

الحنفية قالوا

যদি ইমাম আজম আবু হানিফ রাঃ এর ব্যক্তিগত মাযহাব হতো তাহলে তো বলা হতো ,

قال أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه.

আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবেত রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন!
অর্থাৎ,এইভাবে বলা উচিৎ ছিল।

কিন্তু আমরা দেখেছি যে হানাফি মাযহাবের ফতোয়া যেখানেই এসেছে সেখানেই বলা হয়েছে,

الحنفية قالوا

যেহেতু এখানে হানাফীয়্যাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেহেতু এখানে ইমাম আজম আবু হানিফ রাঃ এর ব্যক্তিগত মত নয়। বরং তাঁর সাথে যুক্ত আছেন বহু ফক্বীহ- মুজতাহিদগণ। যার কারণে বহুবচন এর সিগাহ ব্যবহার করা হয়েছে।

এখন আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখে নেই , যেখানে ইমামে আজম আবু হানীফা রাহ, এর মতের উপর হানাফী মাযহাবে ফতোয়া না হয়ে বরং উনার ছাত্রদের মতের উপর ফতোয়া রয়েছে ।

হানাফী মাযহাবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতের উপর ফতোয়া

১. ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং মুহাম্মদ রহ. এর মতে এক বিচারক যখন ফায়সার জন্য অন্য বিচারকের কাছে পত্র লিখে। তখন উক্ত পত্রে কি লিখা আছে তা পত্রবাহককে পড়ে শুনিয়ে তারপর তার সামনে সিলমহর মেরে হস্তান্তর করতে হবে। নতুবা এই পত্রটি বিচার কার্য সমাধার জন্য কার্যকরী হবেনা। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে কেবল পত্র লিখে তা বাহককে না জানিয়েও তা অন্য বিচারকের কাছে প্রেরণ করলে

এ দ্বারা বিচার কার্য পরিচালনা করা যাবে। এই মতের উপরই ফতোয়া। সুতরাং এখানে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও মুহাম্মদ রহ. এর মত আমলযোগ্য নয়।

সূত্র - হেদায়া-৩/১২৩-১২৪

২. যখন কোন বোকা টাইপের স্বাক্ষ্য কাযীর মজলিসে স্বাক্ষ্য দিতে হাজির হয় তখন স্বাক্ষিকে বিচারক স্বাক্ষ্যের পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারবেনা। এটা জায়েজ নয় ইমাম আবু হানীফা রহ. ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে অবুঝ ব্যক্তিকে শিখিয়ে দেয়া কেবল জায়েজই নয় উত্তমও। এই মতের উপরই ফতোয়া।

সূত্র - ফাতওয়ায়ে শামী-৮/৫৩

ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মতের উপর ফাতওয়া

১. মিরাস তথা ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের প্রায় সকল মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ রহ এর বক্তব্যের উপর ফতোয়া।

২. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে ওযুর পানি নাপাক। তাই এটি গায়ে লাগলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন-অযুর পানি পাক। তবে এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবেনা। ফাতওয়া এই মতের উপর।

ইমাম যুফার রহ. এর মতের উপর ফাতওয়া

১. যে অসুস্থ্য ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায পড়তে পারেনা সে ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছে বসে নামায পড়তে পারবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এর মতে। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. এর মতে তাশাহুদের সুরতে বসে নামায পড়তে হবে। ফাতওয়া এই মতের উপর। (ফাতওয়ায়ে শামী-২/৫৬৫)

২. তিন ইমামের মতে বাড়ির আঙ্গিনা দেখার দ্বারা ক্রয় করার সময়ের দেখার হক সাকিত হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম যুফার রহ. এর মতে বাড়ির আঙ্গিনা দেখার দ্বারা ভিতরাংশ দেখার হক সাকিত হয়না। এই মতে উপরই ফিক্বহে হানাফীর ফাতওয়া। (ফাতওয়ায়ে শামী-৭/১৫৮)

হানাফী মাযহাবে এরকম বেশ কিছু ফতোয়া দেখা যায় , যেখানে ইমামের ছাত্রের মতের উপর মাযহাবের ফতোয়া রয়েছে । অতএব , মাযহাব মানেই তাকলিদে শাখসি বা একক ব্যক্তির সব মত অনুসরন করা এমনটা বলা অযৌক্তিক ।

হাফিজাকুমুল্লাহ !

তাকলীদ কি ?

Details

তাকলীদ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- অনুসরণ বা অনুকরণ করা। আর পারিভাষিক অর্থে বলা হয়, 'কোন ধরণের প্রমাণাদি চাওয়া ব্যতীত কোন মুজতাহিদ ইমামের জ্ঞান ও সততার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তার দেখানো পথের অনুসরণ করা'। আর অন্তরে এ কথা বিশ্বাস করা যে, উদ্ভূত মাসালায় ইমাম সাহেব নিশ্চিত কোরআন-হাদিসের আলোকে সমাধান করেছেন । আর তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানে ও আমলে এগিয়ে থাকায় আমি তার কথাটির অনুকরণ করছি এবং বিশ্বাস করি যে, তার কথায় কোরআন-হাদিসের বা ইজমা-কিয়াসের দলিল বিদ্যমান রয়েছে ।

তাকলীদ হচ্ছে দু'প্রকার –

১ – তাকলিদে মুতলাক

২ – তাকলিদে মুকাইয়াদ

তাকলিদে মুতলাক বা স্বাধীন তাকলীদ হচ্ছে, নির্দিষ্ট কোন এক ইমাম ব্যতীত বিবিধ মাসালায় বিভিন্ন ইমাম বা মাযহাবের অনুকরণ করা। অপরদিকে, নির্ধারিত কোন এক ইমাম বা মাযহাবের অনুসরণ করাকে তাকলিদে শাখসী বা নির্দিষ্ট তাকলীদ বলে।

তাকলীদ কেন ?

Details

আমরা জানি যে, শারিয়াতের বিধি-বিধান দু'প্রকার –

১ –সু-স্পষ্ট বিধান

এমন কিছু বিধানকে বলে , যা আল্লাহ ও রাসুল সাঃ স্পষ্ট করে দিয়েছেন । এমন বিধানে কারো তাকলিদ করার প্রয়োজন হয় না । যেমনঃ নামাজ ,রুজা ,যাকাত ,হজ্ব ,ব্যভীচারের শাস্তি ইত্যাদি ।

২ – অস্পষ্ট বিধান

এমন কিছু বিধানকে বলে , যা কোরান-হাদিসে সু-স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই । মুজতাহিদ ইমামগণ গবেষণা করে তা সংগ্রহ করে থাকেন । এমন বিধানে যে কোন ইমামের তাকলিদ করা বৈধ ।

অস্পষ্ট বিধান সাধারণত কয়েকটি কারণে হয়ে থাকে –

১ – দলীল বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ

কখনো কোন মাসালায় পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ দলিল পাওয়া যায় । বাহ্যত উভয়টি বিশুদ্ধ মনে হয় । এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কি করবে ? নিঃসন্দেহে কোন একজন ইমামের মতটা গ্রহণ করবে । যেহেতু , সাধারণ মানুষের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সমাধান করার সক্ষমতা নাই ।

২ – শব্দ একাধিক অর্থ সম্পন্ন

কোরানে বা হাদিসে এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায় , যার একাধিক অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা রাখে । এ ক্ষেত্রে সাধারন মানুষ সঠিক অর্থ কোনটি , তা কিভাবে বুঝবে ? কস্মিনকালেও বুঝা সম্ভব না । ফলে, সাধারণ মানুষকে এই ক্ষেত্রে একজন ইমামের মতটা গ্রহণজ করতে হয় ।

৩ – নাসিখ মানসুখ

কোরানে নাসিখ মানসুখ আছে , এমনকি হাদিসেও অসংখ্য আছে । হাদিসে একবার দেখলেন ,রাসুল সাঃ এমনটা করেছেন । অন্যত্রে আবার পেলেন ,রাসুল সাঃ এমনটা করেন নাই । তাহলে কি করে সাধারণ মানুষ বুঝবে কোনটি আমলযোগ্য ? অবশ্যই , এ ক্ষেত্রে ইমামদের অনুসরণ করতে হবে ।

৪ – সিহহাতুল ইস্তেদলাল

কোন একটা হাদিস পেলেন , তবে এটা রাসুলের জন্য নির্ধারিত ছিল , নাকি সকলের জন্য আমলযোগ্য ? তা কি করে সাধারণ মানুষ বুঝবে ? অবশ্যই , এক্ষেত্রেও ইমামদের কথা শুনতে হবে। কারণ , ইমামগণ এসব বিষয়ে ইজতিহাদ করে সঠিক একটা মতে পৌঁছেছেন ।

এছাড়াও আরো বহুবিধ কারণ আছে , যার কারণে তাকলিদ করতে হয় ।এজন্য মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরানে সূরায়ে নাহল এর ৪৩ নং আয়াতে আদেশ করেন –

'তোমরা যদি না জানো ; তবে বিজ্ঞদের জিজ্ঞেস করো'

তাকলীদ এর হুকুম কি ?

Details

আমরা জানি যে, শারীয়াতে মুকাল্লাফ (যার উপর হুকুম আরোপিত) এর অবস্থা দু'ধরণের -

১. মুজতাহিদ - যিনি নিজে নিজে গবেষণা করে কোর'আন-হাদিস থেকে মাস'আলা বের করবেন।

২. মুকাল্লীদ - যিনি মুজতাহীদ কোন ইমাম / আলিমের অনুসরণ করবেন।

উম্মাহের কাছে এই দু'টা রাস্তাই আছে। আপনি হয়তো মুজতাহীদ ; নয়তো মুকাল্লীদ। তৃতীয় তথা বিকল্প কোন প্রকার এর অবকাশ নাই।

যাইহোক, মুকাল্লীদ এর হুকুম নিয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন -

من كان مقلدا لزم حكم التقليد ،فلم يرجح ولم يزيف ولم يصيب ولم يخطئ

অর্থাৎ, যিনি মুকাল্লীদ; উনার উপর তাকলীদ হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তিনি কখনো মতানৈক্য বিষয়ে তারজীহ তথা প্রধান্য দিতে পারবেন না । তিনি কোন মতকে জাল বা ভুল হিসেবে অবিহিত করতে পারবেন না। তিনি কোন মতকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করতে পারবেন না।

সুত্র - মাজমু'আল ফতোয়া, ইবনে তাইমিয়া ৩৫/২৩৩

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ এর অনবদ্য ফতোয়া থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, একজন মুকাল্লীদ কখনো -

১ - মতানৈক্য বিষয়ে ব্যক্তিগত মত প্রাধান্য দিতে পারবেন না

২ - কোন মতকে জাল বলার অধীকার রাখেন না

৩ - কোন মতকে একক শুদ্ধ বলার অধীকার রাখেন না

৪ - কোন মতকে ভুল বলার অধীকার রাখেন না

দ্বিতীয় ফতোয়া -

আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক দ্বীনি ভাইয়ের কাছে একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে যে, তারা মাজহাব মানেন ; তবে কখনো হানাফী আবার কখনো শাফেয়ী কিংবা হাম্বলী। অর্থাৎ, যখন তাদের যেটা সুবিধা ; সেটাই মানেন। উলামায়ে কেরাম এটার বিরোধীতা করলে তারা কতইনা সুন্দর করে বলে _

" চারটা মাজহাবই তো সহীহ। তাহলে যে কোন একটা মানলেই তো চলে "

বস্তুতঃ, এই কথার মধ্য দিয়ে যে, নিজের নাফসের খাহেশাত পূর্ণ হচ্ছে, এটা তারা বুঝেও না বুঝার ভান ধরেন। অথচ, নাফসের খাহেশাতে চলা স্পষ্টতঃ হারাম।

চলুন, আমরা এই ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ - এর ফতোয়া জেনে নেই –

فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لايجوز باتفاق الائمة ونظير هذا ان يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار اذا كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت اذا كان مشتريا فان هذا لايجوز بالاجماع...لان ذالك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة الى ان يكون التحليل والتحريم بحسب الاهواء.

স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুকূলে হলে তারা সেই ইমামের অনুসরণ করে যিনি তাদের স্বার্থ অনুযায়ী বিষয়টি নাজায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। আবার স্বার্থের বিপরীত হলে সেই একই ব্যক্তিবর্গ এমন ইমামের অনুসরণ করেন যিনি বিষয়টি জায়িয বলে ফাতাওয়া দেন। প্রবৃত্তির এমন লাগামহীন গোলামী সকল ইমামের মতেই নাজায়িয ও অবৈধ। এ জাতীয় বিষয়ের একটি উদাহরণ হল, নিজে প্রতিবেশী ও দাবীদার হলে প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে 'ক্রয়ে অগ্রগন্যতার হক' বৈধ বলা আর নিজে ক্রেতা হলে প্রতিবেশীর জন্য তা অবৈধ বলা। এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি বিষয়ে স্বার্থের অনুকূল মাযহাব অনুসরণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা ইজমা তথা সকলের ঐক্যমতে বৈধ নয়। কারণ এটা দ্বীন নিয়ে খেলতামাশার পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী হারাম-হালাল নির্দিষ্ট করণের পথ খুলে দেয়। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যা ৩২/১০০-১০১)

উল্লেখ্যঃ- এখানে আর উল্লেখ্য করে কিছু বলার নাই। বিজ্ঞ ও সু-বিবেচক পাঠক সহজ পাঠ্য ফতোয়া পড়েই বুঝতে পারবেন যে, এক সাথে একাধীক মাজহাবের সুবিধানুযায়ি মত অনুসরণ করা ইসলামে জাইজ নয়।

হাইয়াকুমুল্লাহ !

আরব আলেমদের দৃষ্টিতে তাকলীদ কি ?

Details

আলহামদুলিল্লাহ , আমাদের দেশে আরব আলেমদের যথেষ্ট অনুকরণ রয়েছে । আরব আলেমদের ফতোয়া ও মত নিঃসংকুচে গ্রহণ করে থাকেন । চলমান আলোচনায় জেনে নিব যে , আরবের প্রখ্যাত কয়েকজন শায়খের তাকলিদ নিয়ে অভিমত ।

সালাফী শায়খগণ সহ দুনিয়ার সকল আহলে সুন্নাহের অনুসারী শায়খদেরকে মন থেকে মোহাব্বাত করি। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই, তন্মধ্যে শায়খ উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ -কে মন থেকে একটু বেশী'ই ভালোবাসি। এজন্য উনার ফতোয়া গ্রন্থ, উসুলি গ্রন্থ সহ আকিদার বইগুলা খুব বেশী পাঠ করি। ইস্তেফাদা গ্রহণ করি।

সে'হিসেবে এই লেখায় আপনাদের সাথে শায়খ উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ এর মাজহাব, তাকলীদ ও নিজ দেশের মাজহাব মানার ব্যপারে ফতোয়া নিয়ে আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ !

শায়খ উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহু তা'লা সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদ করার ব্যপারে বলেন -

أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد، لقوله تعالي - فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

সরল অনুবাদ -

যেসব সাধারণ মানুষ সরাসরি শরীয়তের বিধি-বিধান জানতে সক্ষম নন, তাদের জন্য তাকলীদ করা ফরয। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

" তোমরা যদি না জান তাহলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা কর।"

সূত্রঃ - আলউসুল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৮৭

লক্ষ করুন, আমাদের দেশের আলেমগণ যখন তাকলীদ করাকে আবশ্যক বলেন, তখন হয়তো অনেকেই চওড়া হয়ে যান। অথচ, আরবের প্রখ্যাত সালাফী শায়খ রাহঃ এর ফতোয়া দেখুন। তিনি শুধু তাললীদ করার কথা বলেন নাই ; বরং ফরজ ফতোয়া দিয়েছেন।

এবার আসুন, শায়খ উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ নিজ দেশের প্রচলিত মাজহাব অনুসরণ এর ব্যাপারে কি ফতোয়া দিয়েছেন -

لأن فرضك أنت هو التقليد، وأحق من تقلد علماؤك، ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي.
فالعامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم.

সরল অনুবাদ -

নিশ্চয়ই আপনার কর্তব্য হলো - তাকলীদ করা। আর আপনার তাকলীদের সবচে বড় হকদার হল নিজ (দেশের) আলিমগণ। যদি আপনি তা না করে বাইরের দেশের আলিমদের তাকলীদ করেন, তবে তা লাগামহীনতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। সুতরাং সাধারণ মানুষের কর্তব্য নিজ দেশের আলিমদের অনুসরণ করা।

সূত্রঃ - লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ ১৯/৩২

আর কিছু বলবো ?

আসলে কিছুই বলার প্রয়োজন নাই। বুদ্ধিমান ও হক্কের অন্বেষণকারী যারা ; তাদের জন্য ছোট্ট এই দুই ফতোয়াই যথেষ্ট । আর যারা বিশৃঙ্খলা কিংবা ফেতনা পছন্দ করেন, তাদেরকে হাজার ফতোয়া বললেও লাভ হবে না ।

আসুন , এবার জেনে নেই তাকলিদ ও মাজহাব নিয়ে আরবের প্রখ্যাত সসালাফি শায়খ মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী রাহিমাহুল্লাহ এর ফতোয়া কি –

ونحن أيضاً في الفروع، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا ننكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة، دون غيرهم، لعدم ضبط مذاهب الغير؛ الرافضة، والزيدية، والإمامية، ونحوهم؛ ولا نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة .

অনুবাদ: আমরা ফিকহী বিষয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহ.-এর মাযহাবের অনুসারী। যারা চার ইমামের কোনো একজনের তাকলীদ করে আমরা তাদের উপর কোনো আপত্তি করি না। কারণ (চার ইমামের মাযহাব সংকলিতরূপে বিদ্যমান। পক্ষান্তরে) অন্যদের মাযহাব সংকলিত আকারে বিদ্যমান নেই। তবে রাফেযী, যাইদিয়া, ইমামিয়্যাহ ইত্যাদি বাতিল মাযহাব-মতবাদের অনুসরণকে আমরা স্বীকৃতি দিই না। বরং তাদেরকে চার ইমামের কোনো একজনের তাকলীদ করতে বাধ্য করি।

সূত্র -আদ দুরারুস সানিয়্যা ১/২৭৭

শুধু কি তাই ? একদা উনাকে মিথ্যা প্রচার করা হয় যে , মাজহাব ও তাকলি বিরোধী । শায়খ রাহিমাহুল্লাহ এর জবাবে বলেন -

قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء وإني أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد... هذا بهتان عظيم .

অনুবাদ: যারা আমার নামে প্রচার করছে যে, আমি চার মাযহাবের কিতাবগুলোকে বাতিল বলি, আমি নাকি বলি মানুষ ছয়শ বছর ধরে ভুলের উপর আছে, আমি ইজতিহাদের দাবি করেছি এবং তাকলীদকে বর্জন করেছি, (তাদের এই অপপ্রচারের জবাবে শুধু এটাই বলব,) এটা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ।

সূত্র -আর রাসায়েলুস শাখসিয়্যাহ, পৃ. ৪

লেখা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে , নতুবা এক এক করে সালাফী প্রখ্যাত সকল শায়খের ফতোয়া এখানে তুলে ধরতাম ।তবে মনে করি , বুদ্ধিমান ও হক্ব অন্বেষণকারী যে কারো জন্য উপরোক্ত দুই শায়খের ফতোয়াই যথেষ্ট ইনশা আল্লাহ ।

জাযাকুমুল্লাহ !

তাকলিদ ও ইত্তেবা কি ভিন্ন ?

Details

আমরা এতক্ষণে জানলাম যে , তাকলিদ কি ? কেন ? এর হুকুম কি ? আরব আলেমদের ফতোইয়া কি ? ইত্যাদি জানার পর , এখন প্রয়োজন তাকলিদ ও ইত্তেবা নিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া । কেননা , এই বিষয়ে আমাদের দেশে অনেকেই প্রচার করেন যে , তাকলিদ ও ইত্তেবা ভিন্ন বিষয় এবং তাকলিদ হারাম আর ইত্তেবা হালাল ।

প্রিয় পাঠক ,

আসলে তাকলিদ ও ইত্তেবা একই বিষয় । উভয়টি শাব্দিক দিক থেকে যেমন সমার্থক , তেমনি পরিভাষায় সমান উদ্দেশ্য বহন করে থাকে । উল্লেখ্যঃ কেউ কেউ তাকলিদকে অন্ধ বিশ্বাস আর ইত্তেবাকে দলিল সহ বিশ্বাস করাকে বুঝিয়েছেন । বস্তুত , এমন সংজ্ঞা কোরান-হাদিসের কোথাও না থাকায় আমরা এমকন কঠিন কিছু বা কারো ব্যক্তিগত চিন্তাকে অকাট্যভাবে গ্রহণ করতে পারছি না ।

উভয়টির শাব্দিক অর্থ লক্ষ্যণীয় , যেহেতু উভয়টির নির্ধারিত কোন পরিচয় শারিয়া কর্তৃক প্রণীত না । যাইহোক , তাকলিদ ও ইত্তেবা এর অর্থ হচ্ছে , অনুসরণ কিংবা অনুকরণ করা।

কাজি মোহাম্মাদ আলা থানভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন ,

তাকলীদ হচ্ছে – অন্যের কথা ও কাজে ইত্তেবা করা । সূত্র –কাশশাফু ইস্তিলাহিল ফুনুন ,১১৭৮

প্রিয় পাঠক , দেখুন – তাকলিদের সংজ্ঞাতেই কিন্তু ইত্তেবা শব্দ ব্যবহার হয়েছে । সুতরাং , এ কথা প্রমাণ করে যে , মূলত তাকলিদ আর ইত্তেবা একই বা অভিন্ন বিষয় । তবে কেউ যদি দাবি করেন যে , তাকলিদ মানে অন্ধ বিশ্বাস আর ইত্তেবা মানে চাক্ষুষ বিশ্বাস , তাহলে বলব - আপনার বক্তব্যের স্ব-পক্ষে কোরান অথবা হাদিস থেকে প্রমাণ নিয়ে আসুন ! বস্তুত , কোরান-হাদিস এমন কিছুর সংজ্ঞায়ন করেনি ।

মৌখিক বলা বৈ কাজের ক্ষেত্রে যে তাকলিদ আর ইত্তেবা একই বা অভিন্ন বিষয় , তা নিচের ক্ষুদ্র বিতর্কটি পড়লেই বুজগতে পারবেন ,আশা করি ।

একদা ক্যান্টিনে আমার এক আসামী বাঙ্গালী সহপাঠী ও আমি এক সাথে খাবার খাইতেছিলাম । প্রসঙ্গক্রমে, জিজ্ঞেস করলাম -

তুমি কি মোকাল্লীদ ?

সে বললো -

নাহ !

আমি বললাম -

তাইলে কি ?

সে বললো -

আমি ইত্তেবা করি, কারো তাকলিদ করি না।

আমি বললাম -

ইত্তেবা আর তাকলিদে আবার পার্থক্য কি ?

সে বললো -

তাকলিদ মানে, দলিল ছাড়া কাউকে অনুসরণ করা আর ইত্তেবা মানে, দলিল সহ কাউকে অনুসরণ করা।

আমি বললাম -

গোড ! এতক্ষণে পাক্কা বুঝলাম। আচ্ছা, তাহলে তুমি তাকলিদ করো না বুঝলাম, তবে কি কারো ইত্তেবা করো ?

সে বললো -

অবশ্যই, সকল সালাফদের ইত্তেবা করি ।

আমি বললাম -

তাহলে তুমি কি সকল সালাফদের দলিল সহ ইত্তেবা বা অনুসরণ করো ?

সে বললো -

হ্যাঁ, Why not (কেন নয়?) ?

আমি বললাম -

মাশা আল্লাহ ! আচ্ছা তাহলে , এই মুহুর্তে কি তোমার সালাফদের সকল দলীল জানা আছে ? বা মুখস্থ আছে ?

সে বললো -

এ আবার কি? মুখস্থ থাকতে হবে কেন ? আর সকল মাসালার দলিল জানা থাকা কি সম্ভব ?

আমি বললাম -

কেন ? তুমি না বলছ, সালাফদের ইত্তেবা করো ? আর ইত্তেবা মানে তো তুমি বললা - দলীল সহ অনুসরণ করা ? দলিল জানা না থেকেও ইত্তেবা আবার হয় কিভাবে ?

সে বললো -

আরে ভাই, দলিল জানা না থাকলেও বিশ্বাস আছে যে, সালাফদের কথায় দলিল আছে। তাই ইত্তেবা করি।

আমি বললাম -

আহারে ভাই, যারা তাকলীদ করেন। তারাও বিশ্বাস রাখেন যে, যাদেরকে তাকলীদ করতাছেন ; তাদের কাছে অবশ্যই দলীল

আছে। তাহলে ইত্তেবা আর তাকলিদে পার্থক্য রইলো কোথায় ?

সে বললো -

আহারে ভাই, এসব বাদ দেন তো ! এসব আলোচনা বাদ দিয়ে এখন বলেন, বিয়ে করবেন কবে ?

আমি বললাম -

বিয়ে তো করবো ঠিক। তবে আপনাকে বলবো না!

সে বললো -

কেন ?

আমি বললাম -

বিয়ে যে করবো, এর কোন দলিল(ডকুমেন্ট) এখন আমার কাছে নাই। আর দলিল ছাড়া বিয়ের কথা আপনাকে বলেও লাভ নাই। বললেও তো আর আপনি বিশ্বাস করবেন না। কারণ, আপনি তো আবার দলিল ছাড়া কারো কথা গ্রহণ করেন না।

পাশের টেবিল থেকে এসব ঝগড়াঝাটি শুনতেছিলো আমাদের খাটি দেশি এক বাঙ্গালী দুষ্ট বন্ধু। সে গলা চেচিয়ে বলে উঠলো -

ধুরহ ! " যেই লাউ ; সেই কদু " __ এ নিয়ে আর কতো বিতর্ক করবা ? লাউ হোক আর কদু হোক, খাইতে তো আর এক ! খাওয়ার সময় তো কেউ ভিন্ন করতে পারে না! তাহলে " ঘাড়ের নাম গর্দনা আর গর্দনার নাম ঘাড় । এসব নিয়ে আর কতো ঝগড়াঝাটি করবা ?

হাইয়াকুমুল্লাহ !

সাহাবা যুগে কি তাকলীদ ছিল ?

Details

আল্লাহু আকবার ! তাকলিদ তো শারিয়তের একটা শাস্বত বিষয় , যা সাহাবা যুগ থেকেই পরম্পরা চলে আসছে । আমাদের কিছু ভাই কেন বা কিভাবে যে তাকলিদ বিরোধিতা করেন , তা আমার বোধগম্য নয় । আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুক !

প্রিয় পাঠক ,

এই লেখায় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সাহাবা যুগের তাকলিদ নিয়ে । আর সাহাবা যুগের ভুরি ভুরি তাকলিদের দৃষ্টান্ত রয়েছে , হাজার হাজার প্রমাণ থেকে মাত্র একটা প্রমাণ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো । বিচক্ষণ ও চিন্তাশীলদের জন্য একটা প্রমাণই যথেষ্ট , ইনশা আল্লাহ !

এর পূর্বে , একটা বিষয় পরিস্কার করে নেই যে , আমাদের ভাইদের দাবী - তাকলিদ মানে অন্ধ বিশ্বাস আই মিন দলিল ছাড়া কারো কথা মেনে নেওয়ার নাম । তাহলে দেখে নেই , সাহাবা কি দলিল ছাড়া কোন কথা বা ফতোয়া মেনে নিয়েছেন কি না !

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ রাঃ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে,

"আমাদের নিকট হুযরত মু'আজ বিন জাবাল রাঃকে শিক্ষক এবং আমির হিসেবে রাসুল সাঃ পাঠালেন । আমরা তখন তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম , যে তার এক মেয়ে ও এক বোন রেখে ইন্তেকাল করেছে (তাদের সম্পত্তি বন্টন

নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে) । তখন তিনি বোনকে অর্ধেক এবং মেয়েকে অর্ধেক দেওয়ার ফতোয়া দিলেন ।

সূত্র – বুখারী ,৬৭৩৪

প্রিয় পাঠক ,

এখানে কয়েকটা বিষয় লক্ষ্যণীয় –

১ – মুয়াজ বিন জাবাল রাঃ দলিল উল্লেখ করা ছাড়াই ফতোয়া দিলেন ।

২ – প্রশ্নকারীরা দলিল জানা ছাড়াই মেনে নিলেন ।

দলিল ছাড়া কোন ফতোয়া গ্রহণের নাম অন্ধ তাকলিদ হলে আর এই তাকলিদ হারাম হয়ে থাকলে , তাহলে এই হারাম কাজ সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে করতে পারলেন ?

আল-ইয়াজুবিল্লাহ ! আমরা বিশ্বাস করি যে , সাহাবা থেকে কোন হারাম কাজ সংগঠিত হতে পারে না ইনশা আল্লাহ । সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই রাসুল থেকে জিজ্ঞেস করে নিতেন । সাগীর সাহাবা বড় সাহাবী থেকে জেনে নিতেন । আর এভাবেই তাকলিদ এর চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে । কিন্তু, আফসোসের ব্যাপার হলো – অধুনা সময়ে এসে কেউ কেউ বলেন , দলিল ছাড়া কারো কথা গ্রহণের নাম অন্ধ তাকলিদ আর এই তাকলিদ নাকি হারাম । আল্লাহ সবাইকে এমন বাড়াবাড়ি বলা থেকে হেফাজত করুক ।

আর সাহাবা যুগ থেকে যে তাকলিদ চলে আসছে , এটা স্বীকার করে আরবের প্রখ্যাত সালাফী আলেম শায়খ মোহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন রাহঃ বলেন –

" এতে কোন সন্দেহ নাই যে, সাহাবা যুগ থেকে নিয়ে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা অজ্ঞতা কিংবা অপরিপক্ক জ্ঞানের কারণে নিজে নিজে শারীয়তের মাসলা-মাসাইল উদঘাটন করতে পারেন না। এজন্য তারা আহলে ইলম বা শারীয়তের পান্ডিত ব্যক্তির জিজ্ঞেস করবে। আলিম-উলামা যা বলবে, তা গ্রহণ করবে। আর তাদের কথা গ্রহণ করার নামই হচ্ছে - তাকলীদ "

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ এর পরের পৃষ্ঠায় একেবারে শেষ প্রান্তে এসে বলেন –

" বাস্তবতা হচ্ছে, তাকলীদ সাহাবী যুগ থেকেই বিদ্যমান। তারপর, কোর'আনের একটা আয়াত বর্ণনা করেন "

সূত্র – মাজমু'উ ফাতাওয়া , ৪০৪ পৃষ্টা

সুবহানাল্লাহ !

এবার চিন্তা করুন, আমাদের কিছু ভাইদের কথা। যারা তালীদের নাম শুনলে কি পরিমাণ ঘৃণার-স্তুপে ভরে দেন। অথচ, আরব-আজমে স্বীকৃত ও সর্বজনবিদিত সালাফী শায়খ তাকলীদ নিয়ে কি বলতেছেন ? আর আমাদের দ্বীনি ভাইয়েরা তাকলীদ নিয়ে কি ঘৃণা পোষণ করেন ?

যাইহোক, শায়খ রাহঃ এর ফতোয়া থেকে আমরা কয়েকটা বিষয় ক্লিয়ার হলাম -

১. তাকলীদ সাহাবা যুগেও ছিলো। অতএব, যারা তাকলীদের বিরোধীতা করেন ; প্রকৃতপক্ষে তারা সাহাবীদের কার্যকে অস্বীকার করে। নাউজুবিল্লাহ !

২. তাকলীদ জাইয ও শারীয়াহ সম্মত। যারা তাকলীদ হারাম মনে করেন, তারা মূলত শারীয়ার একটা অকাট্য হুকুমকে অমান্য করেন। আস্তাগফিরুল্লাহ !

৩. যারা শারীয়ার মাসালা-মাসাইল নিজে নিজে উদঘাটন করতে অক্ষম ; তারা অবশ্যই তাকলীদ করবেন। নতুবা, কোর'আনের একাধীক আয়াত অস্বীকার করা হবে।

বারাকাল্লাহ !

তাবেয়ী ও ইমামদের যুগে কি তাকলিদ ছিল ?

Details

প্রিয় পাঠক ,

আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুক ! তাবেয়ি যুগের তাকলিদ এর প্রামাণিকা নিয়ে আর কি লিখব, যেখানে সাহাবা যুগে তাকলিদ নিয়ে হাজার হাজার প্রমাণ রয়েছে , সেখানে তাবেয়ি যুগে তো আরো বেশি থাকার কথা । যাইহোক , আমি এখানে পূর্বর্তীদের থেকে তাকিলিদ এর ব্যাপারে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি , যাতে সম্মানিত পাঠকের এ কথা বিশ্বাস হয় - পুর্ববর্তিদের যুগেও তাকলিদ ছিলো ।

১ – প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইমাম শা'বি রাহিমাহুল্লাহ বলেন ,

" বিচারের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য বিচার পেয়ে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন উমার রাঃ এর কথাকে গ্রহণ করে " ।

২ – প্রসিদ্ধ তাবেইয়ী হযরত আতা রাঃকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো - জানাযার নামাজে সূরায়ে ফাতেহা পড়ার হুকুম কী ? তিনি বললেন –

" আমি কখনো এমনটা শুনুনি , এমনকি জানিও না যে , সূরায়ে ফাতেহাহ পড়তে হয় । তখন লোকটি বলল, ইমাম হাসান বসরী রাঃ এর মত হলো যে, কানাযার নামাজে সূরায়ে ফাতেহাহ পড়তে হবে । তখন তিনি বললেন , তার কথার উপরই আমল করো । হাসান বসরী তো একজন বড় ইমাম । সুতরাং , তার

তাকলিদ করা উচিত" ।

সূত্র – তাহজিবুল কামাল , ৬/১১০

৩ – একদা ইমাম মালিক রাঃ একটা চিঠি লেখেন ইমাম লাইছ রাঃ এর প্রতি । চিঠিতে তিনি বিবিধ প্রশংসা করে বলেন –

" আপনার মর্যাদা এবং সম্মান তো মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ । তারা তো আপনার ফতোয়ার মুখপেক্ষি এবং আপনার প্রদত্ত ফতোয়ার উপরই তারা ভরসা করবে" ।

সূত্র – তারতিবুল মাদারিক , ১/১০

সম্মানিত পাঠক ,

বলতে গেলে অনেক বলা যাবে , অনেক প্রমাণাদি পেশ করা যাবে । তবে , সত্ত্বাণ্বেষীদের জন্য বিশুদ্ধের এই অল্প লেখাই যথেষ্ট হবে , ইনশা আল্লাহ !

আলহামদুলিল্লাহ !

চতুর্থ হিজরীর পূর্বে কি তাকলীদ ছিল ?

Details

সম্মানীত পাঠক,

আহসানাল্লাহু ইলাইকুম !

উপরোক্ত শিরোনামের উপর সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলি। যারা শারীয়ার ইতিহাস পড়েছেন, তাদের অবশ্যই জানা থাকার কথা যে, তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তির অনুসরণ সাহাবা যুগ থেকেই প্রমাণিত। যা আমরা পুর্বে আলোচনা করেছি ।

আমাদের দেশে অনেক দ্বীনি ভাই বলে থাকেন যে, হানাফী মাজহাব মানেই তাকলীদে শাখসী আর তাকলীদে শাখসী হারাম !

তাদের দাবী-দাওয়ার দু'টা বিষয় -

১. হানাফীরা শুধু তাকলীদে শাখসী করে

২. তাকলীদে শাখসী হারাম

একদিন পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর ফতোয়া সমগ্রে চমৎকার একটা হিস্ট্রি পেলাম। যেখানে তাকলীদ শাখসির কথা যেমন এসেছে, তেমনি হানাফী ছাড়া অন্যান্য মাজহাবেও তাকলীদে শাখসী করে, তার যুৎসই প্রামাণ্য রয়েছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন -

والاوزاعي إمام أهل الشام وقد كانوا على مذهبه الى المأة الرا بعة

সরল বঙ্গানুবাদ -

"ইমাম আওজাঈ রাহিমাহুল্লাহ (তিঁনি দ্বিতীয় শতকের ইমাম ছিলেন) একজন ইমাম ছিলেন। শামবাসীগণ চতুর্থ শতক পর্যন্ত তার মাজহাবের উপর ছিলো"।

সূত্র - (২/৫৩৮)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এর ছোট্ট এই তথ্যকণিকা থেকে কয়েকটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় -

১. দ্বিতীয় হিজরী থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত উম্মাহের বিশাল একটা অংশ (শামঃ মূলত বর্তমান চারটা দেশের সমন্নয়ক) নির্ধারিত এক মাজহাবের অনুসারী ছিল বা তাকলীদে শাখসী করতেন।

২. তাকলীদে শাখসী হানাফী ছাড়াও আরো অন্যান্য মাজহাবে বিভিন্ন সময়ে আমল হয়েছে। শুধু হানাফীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়।

৩. দ্বিতীয় হিজরী থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত তাকলীদে শাখসী করেছে শামবাসী। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় ? তাকলীদে শাখসী নিয়ে যারা তুলকালাম করেন, তারা শামবাসী সবাইকে পথভ্রষ্ট বলবেন ? শামে তো তৎকালীন সময়ে অসংখ্য মুহাদ্দীস, মুফাসসির কিংবা ফকীহ ছিলেন !

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান

তাকলীদ ছাড়া কি কেউ আছেন ?

Details

তাকলিদ ছাড়া কি কেউ আছেন ? এক কথায় - না , আমাদের সময়ের কেউই তাকলিদ ছাড়া নয় । যেখান পূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে , সাহাবা ,তাবেয়ী ও পুর্বসূরীরা তাকলিদ করেছেন । সেখানে আমরা পরবর্তীরা কি করে তাকলিদ ছাড়া চলতে পারি ?

আমাদের অনক প্রিয় ভাই দাবী করেন , আমরা তাকলিদ করি না । দলিল ছাড়া কোন কথা বিশ্বাস করি না । খুব ভালো কথা । কিন্তু বাস্তবতা তাই কি ?

আসুন , একটু পর্যালোচনা করে নেই যে , আমাদের যেসব ভাইয়েরা তাকলিদ করেন না বলে দাবী করেন , তারা কখন এবং কোথায় ও কিভাবে তাকলিদ করেন !

ধরুন ,আমরা মাসলা-মাসাইল জানার জন্য একটা ফিকহি কিতাব বের করলাম -

কোর'আন-হাদিসের গবেষণার আলোকে মুফতা বিহী (যে কথায় ফতোয়া রয়েছে) একটা মাসালা গ্রহণ করলাম । বাস, আমরা হয়ে গেলাম অন্ধ মুকাল্লীদ!

উনারা হাদিস জানার জন্য একটা এপ্স বা বাংলা বই বের করলেন -

এপ্সের কোনায়-কানায় বা বইয়ের টিকায় লেখা " সহীহ " দেখেই হাদিস গ্রহণ করলেন। বাস, উনারা হয়ে গেলেন গাইরে মুকাল্লীদ।

এই হিসাবটা আমি বুঝলাম না। উনারা হাদিস সহীহ হওয়ার যে স্বীকৃত পাঁচটা শর্ত আছে, এর ধারে কাছে না গিয়েও জাস্ট কোনায়-কানায় লিখা " সহীহ " দেখেই আমল শুরু করলেন। এটা কি অন্ধ তাকলীদ হয় না ?

ধরুন, হাদীস সহিহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে :

১. সনদ মুত্তাসিল হওয়া।

২. রাবি আদিল হওয়া।

৩. রাবি দ্বাবিত হওয়া।

৪. শায না হওয়া।

৫. মু'আল্লাল না হওয়া।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে নূন্যতম একটা বিষয়েও জাররা পরিমাণ ধারণা না রেখে বা যাচাই-বাছাই না করেই যেভাবেই হোক একজন মুহাদ্দীস সহীহ বলেছেন, বাস উনার কথার উপর

বিশ্বাস করে আমল শুরু করলেন।

এতে করে উনারা গাইরে মোকাল্লিদ হোন কি করে ?

প্রিয় পাঠক,

আপনাদের কি মনে হয় ? যারা বলে বেড়ান, আমরা তাকলীদ করি না। উনারা কি সবাই -

১ - হাদিসের ইত্তেসাল নিয়ে সব জানেন ?

২ - বর্ণনাকারীর আদালত নিয়ে বিস্তারিত জানেন ?

৩ - বর্ণনাকারীর স্মরণ-শক্তির নিয়ে জ্ঞাত আছেন ?

৪ - হাদিসের সুজ্জত নিয়ে আলোকপাত রাখেন ?

৫ - হাদিসের তা'লীলাত নিয়ে জ্ঞান রাখেন ?

ভাইরে, আমার তো বিশ্বাস । উনাদের শিংহভাগই এসব ইস্তেলাহ বা টারম নিয়েই কোন ধারণা রাখেন না। অথচ, দিন শেষে আমার কিছু ভাই দাবী করবেন, আমরা কারো অন্ধ তাকলীদ করি না। আমরা যাচাই-বাছাই করে আমল করি!

বাহ ! কি সুন্দর না ?

সুতরাং , নির্দ্বিধায় বলা যায় যে , আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে তাকলিদ করি । কেউ হয়ত মুখে স্বীকার করি , আর কেউ হয়তো স্বীকার করি না । এই জাস্ট পার্থক্য !

তাকলিদের উদাহরণ নিয়ে আরেকটি লেখা কষ্ট করে পড়ে নিন –

কোর'আনে কারিম এর পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে দু'টি -

১. বুখারী শরীফ

২. মুসলিম শরীফ

বুখারী ও মুসলিম শরিফের হাদিসের ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নাই। মুকাল্লীদ, গাইরে-মোকাল্লিদ সবাই ঐক্যবদ্ধ মেনে নেই যে, এই দুই গ্রন্থের সকল হাদিস বিশুদ্ধ বা সহীহ !

আচ্ছা, বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসগুলা কি মর্মে সহীহ বা কি কি কারণ পাওয়া যাওয়ার কারণে সহীহ হয়েছে, তা আমরা সাধারণ মুসলিম কতজনে জানি ?

হয়তো বলবেন, মুষ্টিমেয় মাত্র ক'জন জানেন, বাকি অধিকংশই না -জানা পাবলিক !

তাহলে , এই যে বুখারী ও মুসলিমের হাদিসগুলা সহীহ হওয়ার কোন কারণ বা বাস্তবতা না জেনেই কেবল বুখারী ও মুসলিম হওয়ার কারণেই একচেটিয়া চোখ বন্ধ করে মেনে নেই ____

বুখারী ও মুসলিমের হাদিস সহীহ।

এটা কি অন্ধ তাকলীদ হয় না ?

সম্মানিত পাঠক, কোন কিছু না বুঝে গ্রহণ করাকে যদি অন্ধ তাকলীদ বলে, তাহলে সহীহ হওয়ার কারণ জানা ছাড়াই বুখারী ও মুসলিমের হাদিসগুলা অকাট্যভাবে অনুসরণ করা কি অন্ধ তাকলীদ নয় ?

আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুক !

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদ !

ব্যক্তির কথার অনুসরণ নাকি দলিলের তাকলিদ ?

Details

আমাদের উপর অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, আমরা নাকি কোরান-হাদিসের তাকলিদ না করে ব্যক্তির কথার তাকলিদ করি । সুবহানাল্লাহ ! এটা একটা স্পষ্ট মিথ্যাচার । আল্লাহ তালা সবাইকে ক্ষমা করুক !

আমরা ইমাম আবু হানীফা রাঃ বা অন্য কারো ব্যক্তিগত কোন কথার তাকলীদ/ অনুসরণ করি না। বরং, উনারা কোর'আন-হাদিসের আলোকে যা বলে গিয়েছেন, তারই অনুসরণ করি। কারো ব্যক্তি কথায় আমল না করে কোর'আন-হাদিসের দলীলের উপর আমল করি।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা কোর'আন এবং সুন্নাহেরই অনুসরণ করি। উনাদের প্রতিটা কথায় কোর'আন এবং সুন্নাহের দলীল রয়েছে। আমরা সেগুলার আলোকেই আমল করি। বস্তুত, আমরা প্রকৃত কোর'আন-সুন্নাহেরই অনুসারী।

উদাহরণস্বরূপ -

আপনি আমাকে একটা মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আপনাকে কোর'আন এবং হাদিস থেকে দলীল সহ সমাধান দিলাম। আপনি সেই অনুযায়ী আমল করলেন।

যেমনঃ একটা মাস'আলা দেখুন

ওজুতে ঘাড় মাসেহ করার বিধান কী ??

ইমামদের ইখতেলাফ আছে । তবে হানাফি মাজহাব এর মতে ওজুতে ঘাড় সহ মাসেহ করা মুস্তাহাব। উনার দলীল -

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

হযরত ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে এবং উভয় হাত দিয়ে গর্দান মাসাহ করে, তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন [আযাবের] বেড়ি থেকে বাঁচানো হবে।

ইমাম আবুল হাসান ফারেছ রহঃ বলেছেনঃ

وَقَالَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

ইনশাআল্লাহ হাদীসটি সহীহ। [তালখীসুল হাবীর-১/৯৩, দারুল কুতুব প্রকাশনী-১/২৮৮,মুআসসা কুরতুবিয়্যাহ প্রকাশনী-১/১৬৩]

নোট – হাদিসটা নিয়ে অনেক ইমামই কথা বলেছেন । অনেকে জইফ ও বলেছেন।

আপনি আমাকে মাসালাটা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আপনাকে হাদিস থেকে দলীল দিলাম। আপনি আশ্বস্ত হয়ে ওজুর সময়ে ঘাড় মাসেহ শুরু করলেন।

এবার ভেবে দেখুন, আপনি কি আমার ব্যক্তিগত কোন কথায় আমল করলেন ? নাকি কোর'আন এন্ড হাদিস এর দলীল অনুযায়ী আমল করলেন ?

এই হচ্ছে, মোদ্দাকথায় - মাজহাব এর বাস্তবতা। কোর'আন - হাদিসের বিদ্যমানে মাজহাবের ইমামগণ নিজ থেকে সংযোগ করে কিছুই বলেননি। বরং, প্রত্যেকেই আগে কোর'আন এন্ড সুন্নাহ থেকে বলেছেন।

নৈতিকতাঃ- মাজহাব বলতে বাতলানো পথ। আমরা মাজহাবের ইমামদের দেখানো পথ অনুযায়ী কোর'আন-হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করি। আমরা কোর'আন-হাদিসের দলীলের উপর আমল করি। এই সহজ বিষয়টা অনেকে না বুঝে মাজহাবের উপর অপবাদ দেন যে, মাজহাব মানে নাকি কারো ব্যক্তি কথার অনুসরণ !

আল্লাহ তালা সবাইকে রহম করুক

" হানাফী মাজহাব " কী ?

১২০ হিজরী থেকে নিয়ে অদ্যাবধি পর্যন্ত একগুচ্ছ হানাফী ফোকাহাদের সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ ফাতোয়ার সমষ্টিগত নাম " হানাফী মাজহাব "। আর যারা এই ফাতোয়া গ্রহণ করে, তারা হয় " হানাফী অনুসারী "।

এই সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় -

১. হানাফী মাজহাব কোন একক ইমামের ফতোয়া সমষ্টির নাম না ।

কারণ, হানাফী মাজহাবের ফাতোয়াগুলাতে কোন একক ব্যক্তির মতামত প্রাধান্য পায় নাই। হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ফকিহদের সম্মিলিত ফাতোয়া স্থান পেয়েছে। ফলে, এক সাথে একাধীক ব্যক্তির তাকলীদ হয়ে থাকে।

২. হানাফী মাজহাব মানেই আবু হানীফা রাঃ এর ফতোয়া নয়। বরং, পরবর্তী সালাফ-খালাফ অনেক ফোকাহের মতামত ও চিন্তার সমন্বিত নাম হানাফী মাজহাব।

৩. হানাফী মাজহাবে এমনও অনেক ফতোয়া আছে, যা খুদ ইমামে আজম রাঃ এর বাহ্যিক ফাতোয়ার বিপক্ষে রয়েছে। তদুপরি, আদিল্লার ভিত্তিতে পরবর্তীতে খালাফদের ফতোয়া হানাফী মাজহাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

মোদ্দাকথা, তাকলীদে শাখসী হারাম ফাতোয়া দিয়ে হানাফী মাজহাবকে ঘায়েল করা যাবে না। কেননা, হানাফী মাজহাবে হাজারো মুজতাহিদ মুকাইয়াদ ফোকাহার ফতোয়া সন্নিবেশিত হয়েছে।

আকরামাকুমুল্লাহ !

হানাফি মাজহাব এর যাত্রা কিভাবে , কখন থেকে এবং কার মাধ্যমে ?

Details

সম্মানিত পাঠক,

হানাফী মাজহাবের যাত্রা কিভাবে ? কখন থেকে ? কোথায় থেকে ? এবং কার মাধ্যমে ? খুব সংক্ষেপে উপরোক্ত চারটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ। যা সকলের জন্য জানা থাকা একান্ত জরুরী। বারাকাল্লাহু ফীকুম!

১৭ হিজরীতে হযরাত উমার রাঃ এর খেলাফতকালে ইরাক বিজয় হয়। তখন ইরাক্বে তিনি নতুন একটা শহর প্রতিষ্ঠা করেন - কূফা ! উমার রাঃ কূফা শহরকে মুসলমানদের জন্য রাজধানী বা প্রশাসনিক শহর হিসেবে নির্ধারিত করেন।

সেখানকার মুসলমানদের দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ -কে শিক্ষক হিসেবে ইরাক্বের কূফা নগরীতে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ ষোলটি বছর কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ দ্বীনের শিক্ষা দান করেন।

৩২ হিজরীতে তিঁনি মৃত্যু বরণ করলে দ্বীনের শিক্ষা-দীক্ষার দায়ভার চলে আসে ইবনে মাস'উদ রাঃ এর শ্রেষ্ঠতম ছাত্র - আলক্বামা রাঃ এর কাছে। তিঁনিও দীর্ঘ ত্রিশটা বছর দ্বীনের খেদমাত দিয়ে থাকেন।

৬২ হিজরীতে হযরাত আলক্কামা রাঃ মৃত্যু বরণ করলে কূফা নগরীর দ্বীনি দায়িত্ব চলে আসে তাঁরই শ্রেষ্ঠ ছাত্র - ইবরাহীম নাখায়ী রাঃ এর কাঁধে । তিঁনিও দীর্ঘ দিন যাবত কূফায় দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

৯৬ হিজরীতে ইবরাহীম নাখায়ী রাঃ মৃত্যুবরণ করলে কূফা নগরীর দ্বীনি খেদমতের দায়ভার চলে আসে তারই শ্রেষ্ঠ ছাত্র - হাম্মাদ বিন সুলাইমানের উপর। তিনি দীর্ঘ চব্বিশটা বছর কূফা নগরীতে দ্বীনের খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

১২০ হিজরীতে হাম্মাদ বিন সুলাইমান মৃত্যুবরণ করলে সমগ্র কূফা নগরীর দ্বীনি খেদমাত, ফিকহী খেদমাত ও রাহবারিত্ব চলে আসে হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা রাঃ এর কাঁধে।

ইমামে আজম দীর্ঘ ত্রিশটি বছর কূফা নগরীতে কোরান, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি খেদমতে নিরলস মেহনত ও রাহবারিত্ব করে যান।

ছকের মাধ্যমে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ - এর শিক্ষক তালীকার পরম্পরা তুলে ধরলাম -

ইমাম আজম আবু হানীফা

↓

হাম্মাদ বিন সুলাইমান

↓

ইবরাহীম নাখায়ী

↓

আলক্বামা

↓

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ

↓

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ

উপরোক্ত ছক থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত যে, কূফা নগরীতে দ্বীনের জ্ঞান বিস্তার লাভ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ থেকে। কেই এই জ্বলীল কাদর সাহাবী ? উনার সম্পর্কে দু'একটা হাদিস জেনে নেই -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ রাসূল সাঃ এর সঙ্গি ছিলেন। জীবনের বিরাট একটা সময় রাসূলের সাথে কাটিয়েছিলেন। রাসূলের পরিবারের সাথে বেশ সখ্যতা ও আসা-যাওয়া ছিল। দূরবর্তী অনেক সাহাবা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ -কে রাসূলের পরিবারের একজন মনে করতেন।

" কেউ যদি কোরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেভাবে তেলাওয়াত করতে চায়; সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ কে অনুসরণ করে" । মুসনাদে আহমাদ,১৮৪৫৭

প্রিয় পাঠক,

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ এর অসংখ্য ফজিলত থেকে মাত্র একটা বর্ণনা এখানে তুলে ধরলাম। সচেতন ও বুদ্ধিমান মেধাবী পাঠকের জন্য এটুকুতেই বুঝা যথেষ্ট যে, তিঁনি একজন উচ্চপর্যায়ের জ্ঞানী সাহাবী ছিলেন।

যাইহোক , রাসূল সাঃ এর সাহচর্য-ধন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাঃ এর মাধ্যমে দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান ইরাকের কূফা নগরীতে পৌঁছে। এক এক করে সেই দ্বীনে জ্ঞানের গুরু দায়িত্ব ১২০ হিজরীতে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ এর কাঁধে চলে আসে।

ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ হাদিসে-খেদমতের পাশাপাশি ফিকহী জ্ঞানের পিছনে মনোনিবেশ করেন। এক পর্যায়ে কূফা নগরীর আনাচ-কানাচে তাঁর ফিকহী পান্ডিত্বের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এতে দূরদূরান্তর থেকে অসংখ্যা ছাত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এক পর্যায়ে ফিকহী সংকলন এর সু-চিন্তা চলে আসে এবং ছাত্রদের মধ্যে ইমামে আজম আবু হানিফা রাঃ এর ফিকাহ জ্ঞান আহরণের মাত্রা বেড়ে যায়। তখন আবু হানিফা রাঃ কূফা নগরীর প্রসিদ্ধ চল্লিশজন (৪০) মুজতাহিদ ফকীহ নিয়ে ফতোয়া বোর্ড গঠন করেন। বোর্ডের গুরু দায়িত্ব ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ গ্রহণ করেন। প্রতিটা নতুন ও উদ্বুদ্ধ মাস'আলা ফতোয়া বোর্ডে উঠানো হতো। সেখানে চল্লিশজন মুজতাহিদ ফকীহ ইলমি মোনাকাশা করতেন। সবশেষ, সকলের আলোচনা শেষে ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ সু-চিন্তিত সিদ্ধান্ত দিতেন। আর সেখান থেকে হানাফী মাজহাবের যাত্রা সূচিত হয়।

আস্তাগফিরুল্লাহ !

হানাফী মাজহাব এর বৈশিষ্ট কি ?

Details

হানাফী মাজহাবের বৈশিষ্ট বলতে এখানে বুঝানো হচ্ছে , ইমামে আজম আবু হানিফা রাহঃ এর ফতোয়া প্রদানের মূলনীতি । আমরা এই লেখাতে জেনে নিব যে , ইমামে আজম আবু হানিফা রাহঃ কিভাবে ফতোয়া দিতেন ।

সহীহ সনদে ইমাম আবু হানীফা রাহঃ থেকে যে নীতিমালা উল্লেখিত হয়েছে , তার মূল খোলাসা হলো -

১ - মাসআলার সমাধান যখন কিতাবুল্লাহতে পাই তখন সেখান থেকেই সমাধান গ্রহণ করি। অর্থাৎ, কোন মাসালা সামনে এলে তিনি প্রথমে কোরানে তার সমাধান খুঁজতেন ।

২ - কোরানে না পেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ এবং সহীহ হাদীস থেকে গ্রহণ করি, যা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সহীহ হাদীস আমাদের জন্য শিরোধার্য। একে পরিত্যাগ করে অন্য কিছুর শরণাপন্ন হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

৩ - হাদিসেও যদি না পাই তবে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তের শরণাপন্ন হই। বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত ,তাদের বিভন্ন কথা গ্রহণ করি ।

৪ – কোরান , হাদিসু রাসূলিল্লাহ ও ইজমায়ে সাহাবার সামনে কিয়াস চলতে পারে না। তবে যে বিষয়ে সাহাবীগণের একাধিক মত রয়েছে সেখানে ইজতিহাদের মাধ্যমে যার মত কিতাব-সুন্নাহ্র অধিক নিকটবর্তী বলে মনে হয় তা-ই গ্রহণ করি।

৫. মাসআলার সমাধান এখানেও পাওয়া না গেলে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছে থাকি। তবে এক্ষেত্রেও তাবেয়ীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হই না।

সূত্র - আলইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা, ইবনে আবদিল বার পৃ. ২৬১, ২৬২, ২৬৭

আর এই বিষয়ে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ বলেন,

إذا جاء الحديث الصحيح الاسناد عن النبي ﷺ عن الثقات أخذنا به فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم

'যখন নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো হাদীস সহীহ সনদে আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তা গ্রহণ করি। যখন এরূপ কথা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয় তখন আমরা তাঁদের কথার বাইরে যাই না। আর যখন তাবিয়ীগণের কথা বর্ণিত হয় তখন আমরা তাঁদের সাথে ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করি।'

সূত্র - সাইমারী, আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৭৪; ইবন আব্দুল বার, আল-ইনতিকা পৃ. ১৪৪।

সম্মানিত পাঠক ,

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ! এই ছিলো ইমাম আজম আবু হানিফা রাহঃ এর ফতোয়া গ্রহণের মূলনীতি । প্রথমেই কোরান , হাদিস , ইজমায়ে সাহাবা থেকে দলিল গ্রহণ করতেন । এসবে একান্ত কোন মাসালার সমাধান না পেলে কিয়াসের শরণাপন্ন হতেন ।

সুবহানাল্লাহ ! অথচ , আমাদের অনেক ভাই দাবী করেন যে , আবু হানিফা রাহঃ শুধু কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন । আল্লাহ ক্ষমা করুক ! এটা স্পষ্ট মিথ্যাচার ।

গাফারাল্লাহু লানা

হানাফি মাজহাব এর উসুল কি ? (১)

Details

উসূল অর্থ হচ্ছে , মূলনীতি । যে মুলনীতির আলোকের কোরান-হাদিস থেকে মাসালা-মাসাইল বের করা হয়ে থাকে । উসূল বা মূলনীতি প্রত্যেক মাজহাবেই বিদ্যমান রয়েছে । আমরা এই লেখায় হানাফি মাজহাবের চমৎকার দু'টি মূলনীতি জানব , ইনশা আল্লাহ । এতে করে আমাদের অনেক ভুল ধারণা দুরিভূত হবে , ইনশা আল্লাহ !

উসূল বা মূলনীতি আবার কী ?

আমরা হাদীসে যা পাব ; তাই আমল করবো। তাই না ?

উপরের কথাগুলো মানুষ দু'কারণে বলে –

১. হাদিস সম্পর্কে অজ্ঞতা

২. উসূল সম্পর্কে অজ্ঞতা

অথচ, নিয়ম হচ্ছে - একটা হাদিস জানার পর সেটার উপর আমল করতে হলে সেই হাদিসটার অবস্থা ও আমলের মূলনীতি জানতে হবে। নতুবা, সহজে বিভ্রান্তিতে পতিত হতে পারেন ।

উসূল কি জিনিস ?

আর এটার প্রয়োজনীয়তা কি?

বা এটার ব্যবহারবিধী কি ?

ইত্যাদি সব বিষয়ের জবাব সংক্ষিপ্ত একটা হানাফী মাজহাবের উসূল বা মূলনীতি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তাওফীক দাতা !

ধরুন,

হানাফী মাজহাবের একটা উসূল হচ্ছে -

কোন রাবী যদি একটা হাদীস বর্ণনা করেন এবং হাদিসটা সহীহ। কিন্তু, রাবী এর বিপরীত আমল করে থাকেন। তাহলে হানাফী মাজহাবের মূলনীতি হল - বর্ণনাকারীর হাদীস ধর্তব্য না ; বরং উনার আমল'ই ধর্তব্য। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদিস'টা মানসুখ (রহিত) আর আমলটাকে নাসিখ (রহিতকারী) হিসেবে বিবেচ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ -

১. আবু হুরায়রা রাঃ বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাঃ বলেছেন - যদি কুকুর তোমাদের কারো পাত্র থেকে পান করে নেয়, তাহলে সে যেন তা সাত বার ধৌত করে নেয়। (বুখারী;মুসলিম)

এই হাদিস'টার দিকে লক্ষ্য করুন! স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে, কোন পাত্রে কুকুর পান করে থাকলে, সেটাকে সাত বার ধৌত করতে হবে। আর হাদিসটা বর্ণনা করেছেন আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু!

কিন্তু, অপর আরেকটা সহীহ হাদিসে পাওয়া যায় যে, আবু হুরায়রা রাঃ নিজেই এমতাবস্থায় সাত বার ধৌত না করে মাত্র তিন বার ধৌত করার ফতোয়া দিয়েছেন !

সূত্র – সুনানে দারে কুতনি , ১/৬৬

এবার দেখা গেলো -

আবু হুরায়রা রাঃ এর বর্ণিত হাদিস এবং তার ফতোয়ার মধ্যে পরস্পর বিরোধ রয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর বর্ণিত হাদিসে সাত বারের কথা আর আমলে পাওয়া যায় তিন বারের কথা।   এমতাবস্থায়, উম্মাহের করণীয় কী ? করণীয় হলো, একটা মূলনীতি দাঁড় করা বা উসূল এর দিকে ধাবিত হওয়া !

এই জায়গায় এসে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ ফতোয়া দেন যে, রাবীর আমলের উপর হুকুম সাব্যস্ত হবে। কারণ, বর্ণিত হাদিস'টি মানসুখ হতে পারে। নতুবা, জালিল কদর সাহাবী কখনো রাসূল সাঃ এর কথার বিপরীতে আমল করতেন না।

এবার,

আপনাদেরকে শেষ একটা কথা বলি -

ধরুন,

আপনি একটা হাদিসের গ্রন্থ ও একটা হানাফী মাজহাবের ফতোয়া গ্রন্থ পড়তাছেন।

১. হাদিস গ্রন্থে পড়লেন –

রাসূল সাঃ বলেছেন - কুকুরে পান করলে পাত্র সাতবার ধৌত করতে হবে।

২. ফতোয়া গ্রন্থে পড়লেন –

ইমামে আজম বলেছেন - কুকুরে পান করলে তিনবার ধৌত করলে চলে।

আপনি না জানেন উসূল, না জানেন হাদিসের হুকুম - তবে উভয়টা পড়ে বললেন -

সর্বনাশ ! আবু হানীফা রাহঃ এসব কি করলেন ? রাসূল বলেছেন, সাত বার আর তিনি ফতোয়া দিলেন তিন বার !!

তখন হয়তো আরো বলবেন, আশ্চর্য! আবু হানীফা তো কোন হাদিস'ই জানেন না। শুধু কিয়াস করেন। নিশ্চিত, আবু হানিফার কাছে এই হাদিস পৌঁছে নাই!

প্রিয় ভাই আমার,

মাজহাবের বিষয়টা ঠিক এই জায়গায় এসে ঠেকে। আপনি হয়তো আক্ষরিক জ্ঞান দিয়ে দেখতাছেন - আবু হানীফা রাঃ বুখারী /মুসলিম কিংবা অন্যান্য সহীহ হাদিস থাকা সত্ত্বেও নেননি। কিন্তু, পিছনের কাহিনি হয়তো জানেননি। তাই তো, মন চাহিদা আজেবাজে কথা বলছেন! আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুক!

ফি হিফজিল্লাহ !

২

হানাফী মাজহাবের একটি চমৎকার উসূল বা মূলনীতি এবং মাজহাব নিয়ে বিভ্রান্তির নিরসন

ইতিপূর্বে বলেছি যে, হাদীস কিংবা ফিকাহ বলেন ; মূলনীতি না জানার কারণে অনেকের মনে বিভ্রান্তি তৈরী হয়। ফলে, যে কোন মাজহাব নিয়ে সহজে গালমন্দ বা বদ-গোমান চলে আসে। বস্তুত, কেউ যদি প্রত্যেক মাজহাবের স্বতন্ত্র মূলনীতিগুলা

জানে ও ভালো করে বুঝে, তাহলে আশাকরি কেহ মাজহাবকে কোর'আন-হাদিসের মুখামুখি হিসেবে দাঁড় করাবে না।

হাদীসের ক্ষেত্রে হানাফী মাজহাবের একটা চমৎকার মূলনীতি বা উসূল হলো -

" খবরে ওয়াহিদ হাদীস যদি কোর'আনে কারীমের আ'ম আলোচনার বিপরীত বা বর্ধিত কিছু হয়, তাহলে কোর'আনের আ'ম আলোচনার উপর আমল হবে। খবরে ওয়াহীদকে কেতঈ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। "

নোটঃ হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে দু'প্রকার -

১. মুতাওয়াতীর

এমন হাদিসকে বলে, যার বর্ণনাকারী প্রত্যেক যুগে অগণিত হয়ে থাকেন। এতে মিথ্যার কোন অবকাশ থাকে না।

২. খবরে ওয়াহিদ

এমন হাদিসকে বলে, যার বর্ণনাকারী একজন, দু'জন বা তিনজন হয়ে থাকেন , তবে মুতাওয়াতির পর্যায়ে কখনো না ।

আশাকরি, খবরে ওয়াহীদ কি, তা জানা হয়ে গেছে। এখন উপরোল্লিখিত হানাফী মাজহাবের উসূল বা মূলনীতি এর ব্যাখ্যা দিচ্ছি -

ধরুন, কোর'আনে কারীমে একটা হুকুম এসেছে আর হুকুমটা একেবারে আ'ম (ব্যাপক) আলোচনা। নিয়ম হচ্ছে, আ'ম (ব্যাপক) হুকুমকে খাস (নির্দিষ্ট) করবে কোর'আনের অন্য

আয়াত বা হাদীস।

এবার যদি কোর'আনের আ'ম (ব্যাপক) হুকুমকে খাস (নির্দিষ্ট) করতে চায় কোন খবরে ওয়াহিদ হাদীস, তাহলে এই ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, হাদিসের মূলনীতিতে, খবরে ওয়াহীদ ইলমে জান্নী (সন্দেহপ্রবণ) এর ফায়দা দেয়। কেতঈ বা নিশ্চিত কোন কিছুর ফায়দা দেয় না। যদিও তা রাবীর দিক থেকে বা সব দিক দিয়ে হাদীসটা সহীহ।

এবার উপরোক্ত মূলনীতির একটা উদাহরণ কোর'আন ও হাদীস থেকে পেশ করি -

১. কোর'আনে কারীমে সূরায়ে হাজ্জের ৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন -

اركعوا وواسجدوا

তোমরা রুকু করো এবং সেজদা করো।

খেয়াল করুন, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'লা একটা আম (সাধারণ) ঘোষণা দিয়েছেন সেজদা করার জন্য । সেজদাহ কিভাবে করবে বা কি কি অঙ্গ সেজদার অন্তর্ভুক্ত, তা কোর'আনের কোথাও বর্ণিত নয়। আর সরল অর্থে সেজদাহ হচ্ছে, কপালটা মাটিতে স্পর্শ করালেই চলে।

২. সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাতটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেজদাহ করতে। প্রথমতো, কপাল। তারপর, রাসূল সাঃ ইশারাহ করে বলেন, দু'হাত, দু'হাটু ও দু'পায়ের গোড়ালি ইত্যাদি। (বুখারী ; ১৫৪)

এবার খেয়াল করুন, কোর'আনে বর্ণিত কেবল সেজদা'র কথা। কিন্তু, এই হাদিসে এসেছে - সেজদাহ হতে হবে সাতটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাটির সাথে মিলনের মাধ্যমে। তাহলে পাওয়া গেলো, কোর'আনের আম হুকুমকে এই হাদীস এসে খাস বা নির্দিষ্ট করতেছে।

আমরা পাইলাম, কোর'আনের আ'ম (সাধারণ) হুকুম ও হাদিসের খাস (নির্দিষ্ট) আলোচনা।

এই জায়গায় এসে, ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ বলেন, এ ক্ষেত্রে আমরা কোর'আনের আম হুকুমকে প্রাধান্য দিবো। হাদিসের খাস হুকুমকে আম হুকুমের উপর প্রাধান্য দিবো না। কেননা, হাদীসটা মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয় ; বরং, খবরে ওয়াহীদ। যদি হাদিসটা মুতাওয়াতির হতো, তাহলে মেনে নিতে কোন বাঁধা ছিলো না। কেননা, মুতাওয়াতির হাদিস ইলমে ইয়াকিন এর ফায়দা দেয় আর খবরে ওয়াহীদ ইলমে জান্নি এর ফায়দা দেয় ।

নোটঃ এই মূলনীতিতে, ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ খবরে ওয়াহীদকে ফারজ হিসেবে না ধরে সুন্নাহ হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।

শেষকথা , উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম যে, হাদীস কেবল সহীহ হলে আর বুখারীতে আসলেই আমলের উপযুক্ত হয় না। বরং, আরো কিছু কথা বাকি থেকে যায়। আর বাকি কথার মধ্যে এটি অন্যতম একটি !

সহীহ হওয়া সত্ত্বেও খবরে ওয়াহীদ হাদিসকে গ্রহণ করা যাবে কি না, এই ব্যাপারে ইমামদের বিশাল মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ বলেন, পাঁচটি শর্তের মাধ্যমে খবরে ওয়াহীদকে গ্রহণ করা যায় অন্যথায়, তা সহীহ হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করা যাবে না ।

এবার, আপনি হয়তো খবরে ওয়াহিদ চিনেন না, মুতাওয়াতির জানেন না, ওয়াহিদ গ্রহণ করার শর্ত জানেন না। কিন্তু, শুধু দেখলেন হাদীসটা সহীহ বা বুখারী/মুসলিমে এসেছে ; বাট, আবু হানীফা রাঃ গ্রহণ করেন নাই ।

তাহলে কি বলবেন, আবু হানীফা হাদীস জানেন না ? আবু হানীফার কাছে হাদীস পৌঁছে নাই ? আবু হানীফা দূর্বল রাবী ? আবু হানীফা হাদিস বিরোধী ?

সাবধান ! নিজের অজ্ঞতা দিয়ে কখনো উম্মাহের সালাফগণের ব্যাপারে মিথ্যা ধারণা করবেন না। উনারা কোর'আন-হাদিসের বিশাল পান্ডিত্ব নিয়েই ফতোয়া দিয়েছেন। সবকিছুর এদিক-ওদিক বিবেচনা করেই রায় দিয়েছেন। আলোচিত মাস'আলায় দেখেন, তিনি হয়তো খবরে ওয়াহিদ হাদিসকে ফারজ হিসেবে গ্রহণ করেন নাই, তবে কি কোর'আনের উপর আমল করেন নাই ? তাহলে কোন বিবেকে আপনি বলবেন, হানাফী মাজহাব মানেই কোর'আন-হাদীস বিরোধী ??

হানাফি মাজহাব এর হাদিস কি জইফ ? ১

Details

অধুনা সময়ে এসে উম্মাহ একটা বিশাল ঝামেলায় আপতিত। চার মাজহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম, আবু হানিফা রাঃ মাসালা-মাসাইলে যে হাদিসগুলা রেফার করেছেন, সেগুলোর অধিকাংশ নাকি জঈফ বা দূর্বল __ এমন একটা বিশাল অজ্ঞতাপূর্ণ তুহমত ছড়িয়ে পড়ছে। যারা ছড়াচ্ছেন, তারা নিঃসন্দেহে সত্য জানা সত্যেও কেবল হিংসার বশবর্তী হয়ে মিথ্যা - অপবাদ ছড়াচ্ছেন। আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুক __ আমীন!

যাহোক, আজকের লেখায় হাদিসের সনদ নিয়ে আলোচনা করব। যদিও বিষয়টি আহলে ইলমদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; তথাপি আশাকরি সবাই সহজপাঠ্য হিসেবে লেখাটি পাবেন।

মূল কথা -

আমরা জানি, হাদিসের দূর্বলতা দু'দিক থেকে হয়। এক, রাবী বা বর্ণনাকারীর দিক থেকে। দুই, মতন বা মূল হাদিসের দিক থেকে। আমার পর্যালোচনা সনদের দিক থেকে।

আমাদের জানা থাকার কথা, ইমাম বুখারী রাঃ এর জন্মের শতাধিক বছর আগে ইমামে আজম আবু হানীফা রাঃ দুনিয়ায় আগমন করেছেন। এবং তাও জানি যে, ইমাম আবু হানীফা অধিকাংশ মুহাদ্দিসিনদের মতে একজন তাবেয়ী। কারো মতে চারজন, আবার কারো মতে সাতজন সাহাবীর সান্নিধ্য সহ শিক্ষা নিয়েছেন।

ধরুন,

ইমাম আবু হানীফা একজন তাবেয়ী। তাহলে বলা যায়, তিনি কারো থেকে হাদিস গ্রহণ করলে রাবী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সর্বোচ্চ দুই স্তর থাকে। তাবেয়ী → সাহাবী → রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

নোটঃ

সাহাবী মানে, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন।

তাবেয়ী মানে, যিনি কোন এক সাহাবীকে দেখেছেন।

ধরুন,

ইমাম বুখারী রাঃ একজন তাবেয়ে তাবেয়ী। তাহলে বলা যায়, তিনি কোন হাদিস গ্রহণ করলে রাবী এবং রাসূল পর্যন্ত অন্তত চার স্তর থাকে। রাবী → তাবেয়ে তাবী → তাবী → সাহাবী → রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এবার একটা চার্ট পর্যালোচনা দেখুন,

আচ্ছা, মনে করুন একটা হাদিস বর্ণিত হচ্ছে এভাবে পর্যায়ক্রমে -

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

↓

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

↓

উমর ইবনু খাত্তাব রাঃ

↓

আলক্বামা বিন ওয়াক্কাস

↓

ইয়াহয়া বিন সাঈদ

↓

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা

↓

মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল

↓

ইমাম বুখারী রাঃ

আশাকরি, চার্ট দেখে বুঝতে পারছেন যে, একটা হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এখন ইমাম আবু হানীফা ও বুখারীর নিকট এই হাদিসের মান নিয়ে আলোচনা করি -

সংক্ষেপে বলি,

হাদিসটি ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর নিকট সহীহ এবং বুখারী রাঃ এর নিকট জঈফ। এবং উভয়ের সিদ্ধান্ত সহীহ বা বিশুদ্ধ।

বলবেন কিভাবে ?

জ্বী, তাহলে এবার গভীর মনযোগ দিয়ে বুঝার চেষ্টা করুন।

ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর নিকট হাদিসটি সহীহ বা বিশুদ্ধ-

কারণ, তিনি হাদিসটি গ্রহণ করেছেন - আলকামা রাঃ থেকে । কেননা, আবু হানীফা রাঃ উনাকে উনার জীবদ্দশায় পেয়েছেন এবং শিক্ষাদীক্ষা নিয়েছেন। আর সর্বসম্মতিক্রমে, আলক্বামা রাঃ একজন সিকাহ বা নির্ভরযোগ্য রাবি। তাই আবু হানীফার হাদিস গ্রহণ সহীহ বা বিশুদ্ধ। কারণ, উনার পর্যন্ত হাদিসের সনদে বা রাবীদের মাঝে কোন সমস্যা নাই।

ইমাম বুখারীর নিকট হাদিসটি জঈফ বা দূর্বল-

কারণ, তিনি হাদিসটি গ্রহণ করেছেন মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল থেকে। আর, মু'আম্মাল যেহেতু স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে সমালোচিত, তাই ইমাম বুখারী রাঃ উনার বর্ণিত হাদিসটা " সহীহুল বুখারীতে " স্থান দেন নাই। " উমার ইবনে খাত্তাব " থেকে নিয়ে " সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা " পর্যন্ত সকল রাবী সিকাহ হওয়া সত্ত্বেও কেবল " মু'আম্মাল ইবনে ইসমাইল " এর কারণে ইমাম বুখারী রাঃ হাদিসটি " সহীহুল বুখারীতে " স্থান দেন নি।

এবার গভীরভাবে চিন্তা করে বলুন,

ইমাম আবু হানীফার হাদিস গ্রহণ কি অশুদ্ধ ? মোটেও না ! কারণ, ইমাম বুখারী রাঃ যে রাবীর কারণে হাদিসটি জঈফ বলেছেন, ইমাম আবু হানীফা তো উনাকে তথা মু'আম্মালকে পানই নাই। মু'আম্মাল এর জন্মের বহু আগে আবু হানীফা রাঃ মৃত্যু বরণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তো একজন সীকাহ রাবী তথা আলক্কামা থেকে হাদিসটা গ্রহণ করেছেন। তাই নিশ্চিন্তে, আবু হানীফার হাদিস গ্রহণ সহীহ।

তাই সারাংশে উক্ত হাদিসের পর্যালোচনায় বলা যায় -

ইমাম আবু হানীফার এই হাদিসটি গ্রহণ বিশুদ্ধ। কারণ, তিনি একজন সিকাহ রাবী তথা আলক্কামা থেকে হাদিসটি গ্রহণ করেছেন।

আবার একই হাদিস ইমাম বুখারীর গ্রহণ অশুদ্ধ। কারণ, তিনি হাদিসটি একজন জঈফ রাবী তথা মু'আম্মাল থেকে শুনেছেন।

শেষ কথা,

নতুন দ্বীনে আসা প্রেক্টিসিং মুসলিম ভাইদের অনুরোধ করে বলব , কোন হাদিসের ব্যাপারে জঈফ শব্দ শুনলেই নাক ছিটকাবেন না। জঈফ মানেই পরিত্যাজ্য বা নাক ছিটকানো না। জঈফ হাদিস এর প্রকার সবমিলিয়ে মোট -৪৯ টা রয়েছে। সব ক'টি জঈফ হাদিস পরিত্যক্ত বা আমলের অনুপযুক্ত _ ব্যাপারটা এমন না। তন্মধ্যে কিছু হাদিস আছে, যা আমলের

যোগ্য এবং মুহাদ্দিসীনে কেরাম থেকে উক্ত জঈফ হাদিসের উপর আমলের বর্ণনা রয়েছে।

যেমন, ইমাম তিরমিজী রাঃ উনার " জামিউল কাবীর " সম্পরকে বলেন –

جمبع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل العلم ما خلا حديثين...

"আমি এই কিতাবে (সহীহ, হাসান, জঈফ ইত্যাদি) যে হাদিসগুলো এনেছি, তার উপর কোন না কোন আহলে ইলমের আমল রয়েছে..."

ইমাম তিরমিজী রাঃ এর উক্তি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, তখনকার সময়ে ইমাম ও মুহাদ্দিসীনদের মাঝে সঙ্গত কারণে কিছু কিছু জঈফ হাদিসের উপরও আমল ছিল।

তাই আমি আমার দ্বীনি ভাইদের বলব, জঈফ হাদিস শুনলেই আঁতকে উঠবেন না। হাদিসটির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের তাহকীম (সিদ্ধান্ত) জানবেন। তারপর, সিদ্ধান্ত নিবেন ইনশাআল্লাহ ! আল্লাহ আপনাদের প্রচেষ্টাতে বারাকাত দান করুক _ আমীন!

সহীহ হাদিস থাকা সত্ত্বেও জঈফ হাদীসের উপর আমল এর একটা উদাহরণ

১. ইবনে আব্বাস রা. এর হাদিস

حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মেয়ে যাইনবকে প্রথম বিয়ে বহাল রেখেই আবুল আস ইবনুর রাবীকে ছয় বছর পর ফিরিয়ে দিয়েছেন, নতুন করে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি।

সূত্র - সহীহ্ ইবনু মাজাহ (২০০৯) ও জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১১৪৩ হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

Source: আল হাদিস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ,

২. আমর বিন শুয়াইব রাঃ এর হাদিস -

حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد

আমর ইবনু শুআইব (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণিত - রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় কন্যা যাইনাবকে পুনরায় মোহর নির্ধারণ করে এবং নতুন বিয়ের মাধ্যমে আবূল আস ইবনুর রাবীর নিকটে ফিরিয়ে দেন।

যঈফ, ইবনু মাজাহ (২০১০)

ফুটনোটঃ

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিজি রহ. বলেনঃ এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। কিন্তু বিদ্বানগণ এই হাদীসের মর্মানুযায়ী আমল করেছেন। কোন মহিলা যদি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইদ্দত পালনের সময়ই তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার পূর্ব স্বামীর অধিকার অগ্রগণ্য। ইমাম মালিক, আওযায়ী, শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইসহাক প্রমুখ ইমামগণের ইহাই অভিমত।

জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১১৪২

হাদিসের মান: দুর্বল হাদিস

Source: আল হাদিস অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

____

বিশেষ কিছু কথা -

১. প্রথম হাদীসে বলা হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন বিবাহ ছাড়াই আপন মেয়েকে পূর্বের বিবাহের উপর ভর করেই স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদিসে বলা হয়েছে যে, নতুন বিবাহ ও মোহর নির্ধারণ করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. প্রথম হাদিসটা সনদের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ সহিহ আর দ্বিতীয় হাদিসটা ত্রুটিযুক্ত মানে জঈফ। কিন্তু, এই মাসালায় সহীহ হাদিস থাকা সত্ত্বেও জইফ হাদিসের উপর আমল।

৩. কখন সহীহ হাদিসের উপর আমল আর কখন জইফ হাদীসের উপর আমল করা হবে, তা নিজের জ্ঞান দ্বারা বিবেচনা না করা। মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদ ইমামদের ইজতেহাদের উপর ছেড়ে দেওয়া।

৪. সব সহীহ হাদিস যে আমলযোগ্য তা না, আবার সব জইফ হাদিস যে পরিত্যাজ্য তাও না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীত হতে পারে। তাই কোন মুজতাহিদ ইমাম সহীহ হাদিস থাকা সত্ত্বেও স্বীয় ইজতেহাদের উপর ভিত্তি করে জইফ হাদিসের উপর হুকুম করলে অযথা তোহমত না দেওয়া কিংবা বাড়াবাড়ি না করা।

হানাফি মাজহাব এর হাদিস কি জইফ ? ২

Details

হিজরির চতুর্থ শতাব্দী তথা আব্বাসী যুগ থেকে চার মাজহাবের পূর্ণাঙ্গতা, প্রসিদ্ধতা, অনুসরণ-অনুকরণ পুরোদম্পে শুরু হয়। সেই থেকে নিয়ে প্রায় এক যুগ মাজহাব চর্চা হয়। প্রত্যেক মাজহাবের উপর স্বতন্ত্র বই রচনা করা সহ বিশাল খেদমত হয় । আল্লাহ সেসব উলামাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুক _ আমীন!

আধুনিক সময়ে এসে মাজহাবের বিরুদ্ধে বেশী তুলকালাম শুরু হয়। যদিও উনাদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। বিশেষত, আবু হানীফা রাঃ যে সব মাসালা রেফার করেছিলেন, সেগুলোকে দূর্বল বা জঈফ হাদীস প্রমাণে উঠেপড়ে লাগেন।

এর পিছনে মেইন কারণ ছিল __ উসূলুমুল হাদিস ও উসূলুল ফিকাহ ((হাদিস ও ফিকার মূলনীতি)) এর মধ্যকার সমন্বিত জ্ঞান না থাকা। যারা একদম হাদিস নিয়ে গবেষণা ও উসূলুল ফিকাহ উপেক্ষা করেছেন। মূলে তারাই মাজহাবী ইমামদের হাদিসগুলা জঈফ বা দূর্বল প্রমাণে লেগেছিলেন।

বস্তুত, জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার একটা মূলনীতি আছে। হাদিসের যেমন মূলনীতি আছে, ফিকাহ এর ও তেমন আছে। যারা উভয়ের মূলনীতি সামনে রেখে হাদিসের তাহকীম বা বিচার করেন, তাদের কাছে বিরোধ লাগার কথা না। আর যারা উভয়ের সমন্বিত তাহকীম করেন নাই, তাদের কাছে খটকা লাগারই কথা।

তারই একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ নিয়ে সাজানো হয়েছে এই লেখা। এটা হানাফী মাজহাবের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়, তথাপি মনযোগ সহকারে পড়লে আশাকরি বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাওফীক দাতা !

টপিক্স - মাজহুল (অজ্ঞাত) রাবীর হাদীস

মনে করুন, একজন রাবীর (হাদিস বর্ণনাকারি) মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার সকল গুণাবলী বিদ্যমান। কেবল, আদালত নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। অর্থাৎ, তিনি আদিল নাকি ফাসিক __ তা জানা যায়নি। আদিল হলে উনার হাদিস গ্রহণযোগ্য ; আবার ফাসেক হলে উনার হাদিস পরিত্যাজ্য __ এটা সর্বসম্মতি ব্যাপার। কিন্তু, প্রশ্ন হলো ___ উনার আদালতের ব্যাপারে কোন কিছু জানা না গেলে কি হুকুম হবে ??? অন্য কোন হাদিস না পাওয়া গেলে এই ক্ষেত্রে এমন রাবীর হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে কি না ?

[[অনুগ্রহ করে, প্রশ্নটা না বুঝে থাকলে উপরের প্যারাটা বারবার পড়ুন]]

এই ব্যাপারে, ফুক্বাহায়ে কেরাম দু'ভাগে বিভক্ত -

১. আবু হানীফা রাহিঃ, কিছু সংখ্যক শাফেয়ী রাহিঃ ও উনার সাথীবৃন্দের মতে, এমন রাবীর খবর / হাদীস ফিকহী মাসালায় গ্রহণযোগ্য।

সূত্র - ইরশাদু তুল্লাবিল হাকাঈক ১১২

২. ইমাম শাফী, কিছু সংখ্যাক মালেকী ও হাম্বলী ইমামদের মতে, এমন রাবীর খবর / হাদিস ফিকহী মাসালায় অগ্রহণযোগ্য।

সূত্র - মুসতাসফা ১ / ১৯

এমন রাবীর - যার আদালতের ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়েছে - হাদীস গ্রহণে উসূল বিদদের মাঝে দু'ভাগ রয়েছে। এক দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হলে ও অপর পক্ষের জন্য অগ্রহণযোগ্য ছিল। তবে উভয়ের পক্ষে শক্তিমান দলীল বা প্রমাণ রয়েছে -

১. ইমাম আবু হানীফা রাহিঃ ও উনার সাথীবৃন্দের দলীল। উনারা মোট পাঁচটা দলিল পেশ করেছেন ; আমি সেখান থেকে দু'টা তুলে ধরছি -

(ক) একবার মদীনায় রাসূল সাঃ একজন গ্রাম্য লোক থেকে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। অথচ, রাসূল সাঃ ঐ গ্রাম্য লোকের ব্যাপারে মুসলিম ছাড়া অন্য কোন গুণের ব্যাপারে জানতেন না।

সূত্র : হাদিসটি আবু দাউদে -২৩৪০, তিরমিজিতে - ২৯১, নাসায়ীতে -২১১১ ও ইবনে মাজায় -১৬৫২ নাম্বারে রয়েছে

উনারা বলেন, দেখুন - যদি আদালতের ব্যাপারটা জানা থাকা একান্ত আবশ্যক হতো ; তাহলে রাসূল সাঃ কখনো ঐ গ্রাম্য লোকের আদালত না জানা সত্ত্বেও তার চাঁদের ব্যাপারে সাক্ষী গ্রহণ করতেন না।

(খ) রাসূল সাঃ এর মৃত্যুর পরে সাহাবায়ে কেরাম রাঃ অসংখ্য গ্রাম্য লোক, গোলাম ব্যক্তি ও নারীদের থেকে হাদিসের রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। অথচ, সাহাবায়ে কেরাম উনাদের আদালতের ব্যাপারে তেমন কিছু জানতেন না।

সূত্রঃ রাওজাতুন নাজীর - ১৩৮

২. ইমাম শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ইমামদের রাঃ দলীল। উনারাও মোট পাঁচটা দলীল পেশ করেছেন, তন্মধ্যে আমি দু'টা তুলে ধরলাম -

(ক) খবরে ওয়াহীদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ঐক্যমত হলো _ রাবী আদীল হতে হবে। আর উক্ত রাবীর আদালতের ব্যাপারে যেহেতু কিছুই জানা যায়নি, তাই উনার খবরে ওয়াহিদ বা হাদিসটি গ্রহণ করা যাবে না।

(খ) এমন রাবী যেমনিভাবেই আদালতে বা কোর্টে সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নায় ; তেমনি হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে ও গ্রহণযোগ্য নায় ।

মোদ্দাকথা, উভয়ের পক্ষে শক্তিমান দলিল থাকায় এক পক্ষের জন্য এমন রাবীর হাদিস গ্রহণযোগ্য হলেও অপর পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর বিষয়টি এতই দুর্বোধ্য যে, " রাওজাতুন নাজীর " এর মুসান্নীফ রাহিঃ কোন মতকেই তারজীহ বা প্রাধান্য দেননি।

তাই, এমন রাবী থেকে হাদিস নিয়ে দলিল পেশ করলে দলিলের আলোকে হানাফী মাজহাবে বিশুদ্ধ হবে এবং বাকিদের মাজহাবে অশুদ্ধ হবে। কোনটাকে খাটো করা বা কোন মতকে অশুদ্ধ বলা যাবে না।

এবার আসি মূল আলোচনায় -

আপনারা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টত বুঝতে পেরেছেন যে, উভয় পক্ষের দালিলিক আলোচনা মজবুত। এখন যদি ইমাম আবু হানীফা রাহিঃ এমন কোন রাবীর খবরে ওয়াহিদ হাদিসটা কোন মাসালায় ইস্তেদলাল বা দলীল হিসেবে পেশ করেন, তাহলে কি হাদিসটা জঈফ হবে ? পরিত্যক্ত হবে ? আমলের অযোগ্য হবে না ?

শেষ কথা, এরকম কিছু মূলনীতির সাথে পরিচিত না থাকায় অথবা ভিন্ন মাজহাবের হওয়ায় কিছু সংখ্যক ভাইয়েরা হানাফী মাজহাবের ইস্তেদলালকৃত হাদিসগুলা গণহারে জঈফ বা দূর্বল বলে থাকেন। আর আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক ভাইয়েরা না বুঝে বিষয়টাকে ডামাডোল পিটিয়ে প্রচার করে থাকেন। দোয়া করি, রাব্বে কারীম যেন আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন।

বিস্তারিত জানতে, ইমাম গাজালী রাহিঃ এর ' মুস্তাসফা ' পড়বেন। ইবনে কুদামা রাহিঃ এর ' রাওজাতুন নাজীর ' পড়বেন। পৃষ্ঠা নং যথাক্রমে - ১/২৯ ও ১৩৬

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদ

হানাফী মাজহাব এর নির্ভরযোগ্য কিতাব কি

Details

হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব নিয়ে লেখার অন্যতম একটা কারণ হলো - হানাফি মাজহাবের নামে অনেক এমন কিতাব লিখিত হয়েছে , যেখানে মাজহাবের মূলনীতি উপেক্ষা করে অনেক মাসালা সংযোজিত হয়েছে । আবার , এমনও অনেক মাসালা আছে , যা হানাফি মাজহাবের মূল মাসালার সাথে বিরোধ রয়েছে । কিংবা হানাফি মাজহাবের দিকে সম্পৃক্ততা করা হয়েছে , বস্তুত এটা হানাফি মাজহাবের ফতোয়া নয় ! আমাদের হানাফি বিরুধী ভাইয়েরা অনেক সময়ন এমন অনেক মাসালা বর্ণনা করে হানাফী মাজহাবকে ঘায়েল করতে চান ,বস্তুত দেখা যায় এসব বইয়ের মাসালা হানাফী মাজহাবে গৃহীত নয় । এজন্য সচেতন পাঠক বিষয়টা মাথায় রাখা জরুরি মনে করি।

হানাফী মাজহাবের সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বাধিক গৃহণযোগ্য কিতাব সমূহ –

(সময়কালঃ ১৮৯-১৩০৪ হিজরি)

• الأصل ـ محمد بن الحسن الشيباني

2- الجامع الصغير ـ محمد بن الحسن الشيباني

3- الجامع الكبير ـ محمد بن الحسن الشيباني

4 – السير الكبير ـ محمد بن الحسن الشيباني

5- الزيادات ← محمد بن الحسن الشيباني

6 مختصر الطحاوي ← أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر

7الكافي ← الحاكم الشهيد

8مختصر الكرخي ← أبو الحسن الكرخي

9- شرح مختصر الطحاوي ← أحمد بن علي أبو بكر الرازي

13- شرح مختصر الكرخي ← أحمد بن علي أبو بكر الرازي

11 مختارات النوازل ← أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد

12 – مختصر القدوري ← أحمد بن جعفر القدوري

13 – شرح الكرخي ← أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان القدوري

14- التتف في الفتاوى ← علي بن الحسين بن محمد السغدي

15 – شرح القدوري ← أحمد بن محمد بن محمد

16- المبسوط ← علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم

17 – أصول البزدوي ← علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم

18 – المبسوط ← شمس الألئمة السرخسي

11 -المبسوط ← ابو بكر محمد بن الحسين

23- شرح الطحاوي ← علي بن محمد بن إسماعيل السبيجاني

21 – تحفة الفقهاء ← محمد بن أحمد بن أبي أحمد

22 – لمحيط الرضوي ← رضي الدين محمد رضي الدين السرخسي

23 – بدائع الصنائع ← علاء الدين أحمد الكاساني

24 – مختارات النوازل ← علي بن أبي بكر فرغاني المرغيناني

25 – بداية المبتدي ← علي بن أبي بكر فرغاني المرغيناني

26 – الهداية ← علي بن أبي بكر بن عبد الجليل فرغاني المرغيناني

27- المحيط البرهاني ← برهان الدين ابن مازه

28 – الذخيرة البرهانية ← برهان الدين بن مازه

29 – المختار ← مجد الدين

30- الاختيار لتعليل المختار ← عبد اهلل بن مجد الدين

31 – الوقاية ← تاج الشريعة محمود جمل الدين

32 – بديع النظام ← أحمد بن علي بن ثعلب تغلب

33 – مجمع البحرين ← أحمد بن علي بن ثعلب تغلب بن الساعاتي

34 – منية المصلي ← أبو عبد اهلل سديد الدين

35 – الكافي شرح الوافي ← أبو البركات محمود حافظ الدين النسفي

36 –كنز الدقائق ← أبو البركات حافظ الدين النسفي

37 – النهاية شرح الهداية ← الحسين بن حجاج البخاري السغناقي

38- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ← عبد العزيز بن أحمد

39- شرح الوقاية ← عبيد اهلل بن مسعود العبادي

40- نقاية ← عبيد اهلل بن مسعود العبادي المحبوبي صدر الشريعة

41 – كفاية شرح الهداية ← جالل الدين بن شمس الدين الخوارزمي

42 – العناية شرح الهداية ← محمد بن محمد بن محمود

43 – ملتقى البحر ← إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي

44- رد المحتار على در المختار ← ابن عابدين

হানাফী মাজহাবের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহ –

• مقدمة الصالة ← أبو الليث السمرقندي

2- الفتاوى الكبرى ← صدر الشهيد عمر بن عبد العزيز

3- الفتاوى الصغرى ← صدر الشهيد عمر بن عبد العزيز

4- الفتاوى الولوالجية ← ظهير الدين بن أبي حنفية

6 –الملتقط ← ناصر الدين السمرقندي

5 – خالصة الفتاوى ← افتخار الدين البخار

7 – الفتاوى الخانية ← فخر الدين حسن بن منصور

8- التجنيس والمزيد علي بن الفرغاني المرغيناني

9- الفتاوى الظهيرية ← ظهير البخاري

15- الفتاوى األنقاروية ← أحمد بن الحسن الرازي

11- التوضيح شرح التنقيح ← عبيد اهلل بن مسعودالعبادي

11- التوضيح شرح التنقيح ← عبيد اهلل بن مسعودالعبادي

12- الفتاوى التاتارخانية ← عالم الدلهوي الهندي

13- جامع الفصلين ← محمد بن إسرائيل بن عبد العزيز

14 –الفتاوى البزازية ← محمد بن محمد بن شهاب

15- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق ← أبو محمد محمود بن أحمد

16- البنلية شرح الهدية ← أحمد بن حسين الغيتاربي

17- فتح القدير ← كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي

18 التحرير ← كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي

19- درر الحكام شرح غرر األحكام ← علي شهيد بملا

20- خالصة الكيداني ← لطف اهلل النسفي الكيداني

21- مواهب الرحمن ← برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن

22- أدب األوصياء ← علي بن محمد الجمالي .

23- شرح كنز الدقائق ← معين الدين محمد بن عبد اهلل الهروي

24- الاشباه والنظائر ← زين الدين بن أحمد بن محمد

25- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ← زين الدين بن إبراهيم

25 – منح الغفار في شرح ← محمد بن عبد اهلل التمرتاشي

27- تنوير األبصار جامع البحار ← محمد بن عبد أحمد الغزي

28- النهر الفائق شرح كنز الدقائق ← سراج الدين

29- نور الايضاح ← حسن بن عمار بن علي الشرنباللي

30- إمداد الفتاح ـ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي

31- مراقي الفالح ـ حسن بن عمار بن علي الشرنبالللي

32 –مجمع األنهر في شرح ملتقى البحر ـ عبد الرحمن بن محمد

33- الفتاوى الخيرية ـ خير الدين أحمد بن علي زين الدين

34- الدر المنتقى ـ محمد بن علي بن محمد الحصكفي

36 –الدر المختار شرح تنوير األبصار و جامع البحار ـ محمد بن علي

35- غمز عيون البصائر ـ أحمد بن محمد مكي

37- الفتاوى العامدية الحامدية ـ الحامد أفندي بن علي

38 – نهلية المراد شرح هداية ـ ابن العماد عبد الغني بن إسماعيل

39- الطحطاوي على الدر ـ أحمد بن محمد بن إسماعيل

40- الطحطاوي على المراقي ـ أحمد بن محمد بن إسماعيل

41 – اللباب في شرح الكتاب ـ عبد الغني بن طالب بن حمادة

42- عمدة الرعاية على شرح الوقاية ـ عبد الحي بن محمد اللكنوي

43- الفتاوى الهندية جماعة من علماء الهند ـ برئاسة الشيخ نظام الدين

হানাফী মাজহাবের কিতাব; তবে সঙ্গত কারণে মাজহাবে তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ, সে'সব বই থেকে ফতোয়া দেওয়া যাবে না। যদিও হানাফী মাজহাবের উপর লিখিত। মূল কারণ জানি না। আল্লাহু আ'লাম!

1 –شرعة الاسلام ← ركن إالسالم محمد بن أبي بكر الجوغي

2- قنية المنية ← مختار بن محمود الزاهدي الزاهدي

3 –المجتبى شرح القدوري ← مختار بن محمود الزاهدي

4- الحاوي ← مختار بن محمود الزاهدي الزاهدي

6- السراج الوهاج شرح مختصر القدوري ← أبو بكر بن علي الحدادي

5- الجوهرة النيرة ← أبو بكر بن علي الحدادي الحدادي

7 – التسهيل شرح لطائف الشارات ← محمد بن إسرائيل

8- شرح النقاية ← أبو المكارم عبد اهلل بن محمد

9- الخزانة الروايات ← جكن الكجراتي الهندي القاضي

10- جامع الرموز في شرح النقاية ← محمد بن حسام الدين

11- فتاوى ← نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد

12- فتاوى الطوري ← محمد بن الحسين الطوري الطوري

নোট - জর্ডানের জামেয়াতুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয় এর হানাফী ডিপার্ট্মেন্ট থেকে প্রকাশিত একটা আর্টিকেল অবিলম্বে লিখিত ও তাদের অফিশিয়াল ফেইসবুক পেইজ থেকে সংগৃহিত।

প্রিয় পাঠক,

এই হচ্ছে মোটামুটি ১৮৯ হিজরী থেকে নিয়ে ১৩০৪ হিজরী পর্যন্ত হানাফী মাজহাবের উপর লিখিত কিতাব সমূহ। আমি সর্বশেষ আপনাদেরকে একটা কথাই বলতে চাই –

আদিম যুগে, যেই সময়ে খাতা-কলম কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অস্তিত্বের কল্পনাও ছিলো না। তদুপরি মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামের নিরলস পরিশ্রম-সাধনা ও চুলচেরা কোর'আন-হাদিসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের কাছে এই হানাফী মাজহাব পৌঁছেছে।

সুতরাং, হানাফী মাজহাব নিয়ে কোন ধরণের ভিত্তিহীন আপত্তি তুলার আগে ও সমালোচনা করার পূর্বে অনুগ্রহকরে একটু ভেবেচিন্তে নিয়েন। জাযাকাল্লাহ খাইরান !

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান !

ইমাম আবু হানীফা রাঃ এর ফতোয়া বোর্ড কি ?

Details

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ফতোয়া বোর্ড গঠন করেন ইমামে আজম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ । নতুন কোন মাস'আলা সামনে এলে এই মাস'আলাটি ফতোয়া বোর্ডে উপস্থাপন করা হতো। ফতোয়া বোর্ডের সদস্য ছিলেন, মোট ৪০ জন ইমাম, যারা ফিকাহ শাস্ত্রে মুজতাহিদ পযার্য়ের ছিলেন!

ফতোয়া বোর্ডের ৪০ জন সদস্য মাস'আলাটি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। সর্বশেষ, ইমামে আজম আবু হানীফা রাহঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতেন এরপর তা লিপিবদ্ধ করে রাখা হতো।

এভাবে হানাফী মাজহাবের প্রতিটা মাস'আলা ইমামে আজম ও তাঁর মহামান্য ফতোয়া বোর্ডের যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরবর্তীতে, সে'সব মাস'আলাকে ইমামে আজম রাহঃ এর নিকটতম ও ঘনিষ্ঠ ছাত্র ইমামে মোহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শায়বানী রাহিমাহুল্লাহ " জাহিরুর রেওয়ায়াহ " নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। যা মোট ছ'টি কিতাবে সন্নিবেশিত ছিলো।

সেগুলা হচ্ছে -

১. মাবসূত

২. জিয়াদাত

৩. জামিউস সাগীর

৪. জামিউল কাবীর

৫. সিয়ারে সাগীর

৬. সিয়ারে কাবীর

এই ছ'টি কিতাব থেকে হানাফী মাজহাবের বিস্তার লাভ করে এবং এরই মাধ্যমে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ১৩০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হানাফী মাজহাব,আজও অক্ষুন্ন ও সুরক্ষিত রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ !

আসুন, এক নজরে জেনেই -

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত ফিকহী বোর্ডের সৌভাগ্যবান সেই চল্লিশজন সদস্য কারা ছিলেন -

ফিকহী বোর্ডের আমির ছিলেন ইমামে আজম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -

বোর্ডের সদস্যবৃন্দ -

গবেষণা ক্যাবিনেট এর (ফেকাহ বোর্ডের) সদস্যবৃন্দ :

(১) ইমাম যুফার (রহঃ) (১৫৮ হিঃ),

(২) ইমাম মালেক ইবনে মিগওয়াল (রহঃ) (১৫৯ হিঃ),

(৩) ইমাম মালিক ইবনে নাজির তাঈ (রহঃ) (১৬০ হিঃ),

(৪) ইমাম মিনদাল ইবনে আলী (রহঃ) (১৬৮ হিঃ),

(৫) ইমাম নযর ইবনে আব্দুল করীম (রহঃ) (১৬৯ হিঃ),

(৬) ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফা (রহঃ) (১৭০ হিঃ),

(৭) ইমাম আমর ইবনে মায়মূন (রহঃ) (১৭১হিঃ),

(৮) ইমাম হিব্বান ইবনে আলী (রহঃ) (১৭২ হিঃ),

(৯) ইমাম আবু ইসমা (রহঃ) (১৭৩হিঃ),

(১০) ইমাম যুহাইর ইবনে মু'আবিয়া (রহঃ) (১৭৩ হিঃ),

(১১) ইমাম কাসিম ইবনে মা'আন (রহঃ) (১৭৫ হিঃ),

(১২) ইমাম সায়্যাজ ইবনে বিসতাম (রহঃ) (১৭৭ হিঃ),

(১৩) ইমাম শরীফ ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) (১৭৮ হিঃ),

(১৪) ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ (রহঃ) (১৮০ হিঃ),

(১৫) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রহঃ) (১৮১ হিঃ),

(১৬) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) (১৮২ হিঃ) ,

(১৭) ইমাম আবু আসিম নাবিল হামীদ (রহঃ) (১৮২ হিঃ),

(১৮) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নূর (রহঃ) (১৮৩ হিঃ),

(১৯) ইমাম হায়সাম ইবনে বশীর (রহঃ) (১৮৩ হিঃ),

(২০) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (রহঃ) (১৮৪ হিঃ),

(২১) ইমাম আসাদ ইবনে ওমর (রহঃ) (১৮৮ হিঃ),

(২২) ইমাম ইউসুফ ইবনে খালিদ (রহঃ) (১৮৯ হিঃ),

(২৩) ইমাম আলী ইবনে মুসাহির (রহঃ) (১৮৯ হিঃ),

(২৪) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) (১৮৯ হিঃ),

(২৫) ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ইদ্রীস (রহঃ) (১৯২ হিঃ),

(২৬) ইমাম ফজল ইবনে মুসা (রহঃ) (১৯২ হিঃ),

(২৭) ইমাম আলী ইবনে যিরয়ান (রহঃ) (১৯২ হিঃ),

(২৮) ইমাম ফুযাইল ইবনে গিয়াস (রহঃ) (১৯৪ হিঃ),

(২৯) ইমাম আফস ইবনে গিয়াস (রহঃ) (১৯৪ হিঃ),

(৩০) ইমাম হিশাম ইবনে ইউসুফ (রহঃ) (১৯৭ হিঃ),

(৩১) ইমাম শুআইব ইবনে ইসহাক (রহঃ) (১৯৭ হিঃ),

(৩২) ইমাম অকি ইবনুল জারাহ (রহঃ) (১৯৮ হিঃ),

(৩৩) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) (১৯৮ হিঃ),

(৩৪) ইমাম আবু হাফস ইবনে আঃ রহমান (রহঃ) (১৯৯ হিঃ),

(৩৫) ইমাম মুতী'বলখী (রহঃ) (১৯৯ হিঃ),

(৩৬) ইমাম খালিদ ইবনে সুলাইমান (রহঃ) (১৯৯ হিঃ),

(৩৭) ইমাম আব্দুল হামিদ (রহঃ) (২০৩ হিঃ),

(৩৮) ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (রহঃ) (২০৪ হিঃ),

(৩৯) ইমাম হাম্মাদ ইবনে দালিল (রহঃ) (২১৫ হিঃ),

(৪০) ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহঃ) (২১৫ হিঃ) ।

তথ্যসূত্র -

ومناقب الموفق (2/ 133

ومناقب الكردري (1/ 49

والجواهر المضيئة (1/ 140

والفوائد البهية (ص: 295

হানাফী মাজহাব কি ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর চারশত (৪০০) বছর পর প্রতিষ্ঠিত ?

Details

অনেকগুলো প্রোপাগাণ্ডা আর মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুক। এরকম আজগুবি / অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক প্রশ্ন পেয়ে খুব বিব্রত হচ্ছি। কেননা, এসব মিথ্যা-বানায়োটি তথ্য ছড়াচ্ছেন একদল স্কলার/দায়ী ব্যক্তিবর্গ, যাদের অন্ধ অনুসারীগণ না বুঝে / না পড়ে / না জেনে চোখ বন্ধ করে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সালাফদের প্রতি কুৎসা রটাচ্ছেন। আল্লাহ এসব অবুঝ বান্দাদের ক্ষমা করুক !

এই প্রশ্নটা প্রায়ই আমি পেয়ে থাকি যে -

" হানাফী মাজহাব ইমামে আজমের মৃত্যুর ৪০০ বছর পর প্রতিষ্ঠিত। "

আবার এই প্রশ্নটাকে অনেকেই ঘুরিয়ে আরেক অর্থে বলেন যে -

" আবু হানীফার মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে আর হানাফী মাজহাব প্রতিষ্ঠিত ৪০০ হিজরীর পরে "

প্রশ্ন দেখেই বাহ্যত বুঝা যায় যে, হানাফী মাজহাব আর ইমামে আবু হানীফার সাথে কোন সম্পর্ক নাই। কারণ মাঝখানে বিশাল একটা সময়ের তফাৎ রয়েছে। এটা একটা সহীহ ব্লাক মেইল ধরা যায় !

আসলেই কি তাই ? আজ বিষয়টা ক্লিয়ার করবো ইনশাআল্লাহ ।

উত্তরঃ-

মূল লেখাটা পড়ার আগে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে, মাজহাব প্রতিষ্ঠা বলতে কি বুঝায় ?

মাজহাব প্রতিষ্ঠা বলতে দু'টা বিষয় বুঝায় -

১. কোর'আন হাদীস থেকে মাসালা-মাসাইল বর্ণনার পদ্ধতি ও মূলনীতি সর্বস্ব জ্ঞান বিদ্যমান থাকা।

২. মাজহাবের ইমামের ছাত্র থাকা, মাজহাবের বই পুস্তক থাকা, অতঃপর মাজহাবটা মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রচার পাওয়া। ধীরে ধীরে মাজহাবটা অনুসরণীয় হয়ে উঠা।

আর এভাবেই একটা মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে, গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো - মাজহাবের নির্ধারিত মাসালা-মাসাইল ও উসূলের বই-পুস্তক থাকা।

এবার আমরা জানবো যে, তাহলে হানাফী মাজহাবের বই-পুস্তক বা প্রচার-প্রসার কবে থেকে শুরু হয়েছে ?? যদি দেখা যায়, সত্যি ইমামে আজমের মৃত্যুর ৪০০ বছর হানাফী মাজহাবের বই লিখা হয়েছে, তবে ধরে নিব উপরোক্ত প্রশ্ন সত্য।

ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ মৃত্যু বরণ করেন ১৫০ হিজরীতে। তিনি অসংখ্য ছাত্র রেখে যান, তন্মধ্যে উল্লেখ্য তিন জন ছিলেন -

১. ইমাম আবু ইউসুফ

২. ইমাম মুহাম্মাদ

৩. ইমাম জুফার

(রাহিমাহুমুল্লাহ)

ইমাম আজম রাঃ হানাফী মাজহাবের মাসাইল, মূলনীতি ইত্যাদি উনার ছাত্রদের কাছে শিক্ষা দান করেন। তবে সেই সময়ে লেখালেখির প্রচলন না থাকায় ইমাম আজমের স্ব-হস্তে লিখিত ফিকহের বই পাওয়া যায় না। তবে উনার সুযোগ্য ছাত্রগণ ইমামে আজমের ইলম বুকে ধারণ করেন। আর সুযোগ্য ছাত্রদের মাধ্যমেই হানাফী মাজহাবের ইলম-কালাম বিস্তার লাভ করে।

ইমামে আজমের মৃত্যুর পর উনার ছাত্রদের উপর সেই ইলমি দায়িত্ব আরোপিত হয়। তন্মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ দারস-তাদরীস ও বিচার ব্যবস্থাপনার খেদমতে বেশী নিয়োজীত হন। আর ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী রাঃ (১৮৯ হিঃ) দারস-তাদরীসের পাশাপাশি লিখালিখির জগতে বিশেষ মনযোগ দেন।

তিনি তার উস্তাদ ইমামে আজমের সকল মাসালা-মাসাইল সংরক্ষণে " জাহিরুর রেওয়ায়াহ " নামে গ্রন্থ রচনা করেন। যা মোট ছয়টা কিতাবের সন্নিবেশ ছিলো এবং ইমামে আজমের সকল মাসাইল ও উসূল সংকলিত ছিলো।

সেই বই ছয়টি -

১. মাবসুত

২. জিয়াদাত

৩. জামিউস সাগীর

৪. জামিউল কাবীর

৫. সিয়ারে কাবীর

৬. সিয়ারে সাগীর

এই মোট ছয়টি বই হলো হানাফী মাজহাবের আনুষ্ঠানিক যাত্রার বই, যা থেকে তৎকালীন আলিম-উলামা পড়াশোনা ও পড়ানো সহ বিচারিক কার্যক্রম ইত্যাদি শুরু করেন।

এই মোট ছয়টি বই হলো হানাফী মাজহাবের আনুষ্ঠানিক যাত্রার বই, যা থেকে তৎকালীন আলিম-উলামা পড়াশোনা ও পড়ানো সহ বিচারিক কার্যক্রম ইত্যাদি শুরু করেন।

এবার আপনি বলেন তো, হানাফী মাজহাব কি ৪০০ হিজরীর পরে প্রতিষ্ঠিত? আবু হানীফার মৃত্যুর ৪০০ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত ? নাকি ইমামে আজমের মৃত্যুর মাত্র ২৯ বছর পর তথা ১৭৯ হিজরীতে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠিত ?

যাইহোক, হানাফী মাজহাব এর বিস্তার মূলত এই ছয়টি কিতাব থেকে বিস্তৃত। এই ছয়টি কিতাবকে আবার একত্র করেন হাকীম আশ-শাহীদ রাঃ " কাফী " নামক গ্রন্থে।

অতঃপর, সেই কাফী নামক গ্রন্থের প্রায় ৩০ খন্ডের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন ইমাম সারাখসী রাহিমাহুল্লাহ , যা থেকে যুগ যুগ ধরে উম্মাহের ইমামগণ ইলমের সুধা পান করে আসছে।

আমি অতি সংক্ষেপে হানাফী মাজহাবের মূল কিতাবাদী ও সন তুলে ধরছি -

১. জাহিরুর রিওয়ায়াহ (সংকলন ১৮৯ হিঃ)

যা ছয়টি গ্রন্থের সমাহার। ইমাম আজমের ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ রাঃ লিখেছেন।

২. কাফী (লিখা হয়ঃ ৩৩৪ হিজরীতে)

যা উপরের ছয়টি গ্রন্থের একত্র সংকলন। সংকলন করেছেন হাকিম শাহীদ রাঃ।

৩. মাবসুত (লিখা হয়ঃ ৪৮৩)

এটা উপরের কাফী গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যা মোট ৩০ খন্ডে রয়েছে। লিখেছেন ইমাম সারাখসী রাঃ।

এবার চিন্তা করুন,

হানাফী মাজহাব কখন এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো ? আর একদল লোক অনুসারীদের মাঝে কি প্রচার করে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন ?? আর অন্ধ অনুসারীরা না পড়ে / না জেনে / না বুঝে কি তুলকালাম করছে ??

তথ্য সূত্রঃ-

১. উইকপিডিয়া

২. আল-মাজহাবুল হানাফী, লেখক আহমদ বিন মোহাম্মাদ রাহঃ

৩. মানাকিবু ইমামে আবি হানিফা, লেখক , ইমাম যাহাবি রাহঃ

হানাফি মাজহাব কি সহিহ হাদিস বিরোধী ?

Details

খুব প্রচলিত একটা প্রশ্ন হচ্ছে, হানাফী মাজহাব প্রায়ই সহীহ হাদিসের বিপরীত মত দিয়ে থাকে। এটা একটা কমন প্রশ্ন সাধারণ লোকজনের কাছে। এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা জরুরি মনে করছি!

আল্লাহ তাওফীক দাতা !

দেখুন, অনেক মাসালায় আমরা দেখতে পাই যে, হানাফী মাজহাবের এমন কিছু দলীল আছে ; যা বাহ্যত সহীহ হাদিসের বিপরীত রয়েছে। আপনার দেখে মনে হতে পারে,

১. হানাফী মাজহাব সহীহ হাদিস বিরোধী

২. হানাফী মজহাব সহীহ ছেড়ে জইফ জাদিস মানে

৩. হানাফী মাজহাবের কাছে সহীহ হাদিস পৌঁছে নাই

এরকম নানান প্রশ্ন মাথায় ভন ভন করতে পারে। তবে প্রিয় ভাই, হানাফী মাজহাব কেন সহীহ হাদিস পাইলেই গ্রহণ করে না, তা কি কখনো যাচাই-বাছাই করে দেখেছেন ? বা বিজ্ঞ কারো থেকে জেনে নিয়েছেন ? এরকম একটা সুক্ষ্ম বিষয়ে নিয়ে এই লেখায় আপনাদের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা পেশ করবো।

ধরুন ,

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা একটা হাদিস নেই –

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

অর্থাৎ, কোন মহিলা যদি নিজ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তাহলে তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ সহ অনেক মুহাদ্দীস গ্রহণ করেছেন এবং হাদিসের মান হাসান পর্যায়ের। পর্যায়ক্রমে, 2/566, 3/407, 1/605

বাহ্যত দৃষ্টিতে এটি একটি আমলযোগ্য হাদিস। যে কেউ সাধারণ পাঠ করে তাই বুঝতে পারবেন যে, কোন মহিলা অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ করলে ত্র বিবাহ বাতিল।

কিন্তু, এই হাদীসটি ইমাম আজমে আবু হানিফা রাঃ গ্রহণ করেন নি বা হানাফী মাজহাবের এই ফতোয়া গৃহীত হয়নি। অর্থাৎ, হানাফী মাজহাবের ফতোয়া হচ্ছে, কোন মহিলা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করলে তার বিবাহ বাতিল হবে না।

আপনি বলতে পারেন –

হাদিসে এসেছে বিবাহ বাতিল আর আবু হানিফা রাহঃ কি জন্য বিবাহ বাতিল নয় বলে ফতোয়া দিলেন ?

জ্বী, এখানে একটা সুক্ষ্ম রহস্য নিহিত আছে, যা না জানা থাকার কারণে আমরা অনেকেই ইমামের আজমের উপর অপবাদ বা গালি দিয়ে থাকি। আল্লাহ তা'লা সবাইকে ক্ষমা করুক!

সুক্ষ্ম রহস্য হচ্ছে - আলোচিত হাদিসটি হলো 'খবরে ওয়াহিদ'। অর্থাৎ, হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ের নয়। আর খবরে ওয়াহিদ গ্রহণের বেশ কিছু মূলনীতি বা শর্ত আছে, যা পাওয়া গেলে হাদিসটি গ্রহণ করা হবে ; নতুবা নয়!

নোটঃ মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ নিয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

খবরে ওয়াহিদ হাদিসকে গ্রহণ করার জন্য অন্যতম একটা শর্ত হচ্ছে -

" হাদিসটি বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন একজন যেন পরবর্তীতে এই হাদিসের কথা ভুলে না যান বা অস্বীকার না করেন "

খবরে ওয়াহীদ বর্ণনাকারীকে যদি পরবর্তীতে জিজ্ঞাস করা হয় এবং তিনি হাদিস বর্ণনার স্বীকৃতি দেন, তবে হাদিসটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। আর যদি অস্বীকার করেন বা ভুলে যাওয়ার কথা বলেন, তাহলে হাদিসটা অকাট্যভাবে গ্রহণ করা যাবে না।

এবার দেখুন,

উপরোক্ত হাদিসটি সূলাইমান ইবনে মূসা ইমাম জুহরি থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম জুহরি উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, আর ইমাম উরওয়াহ হযরত আয়শা রাঃ থেকে বর্ণনা করেন (হাদিসটি মারফু) ।

চার্টের আলোকে হাদিসের বর্ণনা দেখুন –

মূসা ইবনে সুলাইমান → ইমাম জুহরী → উরওয়াহ → আয়শা রাজিয়াল্লাহু আনহা

উপরোক্ত সনদের সবাই সিকাহ রাবী। কোন অসুবিধা নাই। তবে, একদা ইমাম ইবনে জুরাইহ (রাহঃ) এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম জুহরি (রাহঃ) কে জিজ্ঞেস করেন। ইমাম জুহরি উত্তর দিলেন, জানেন না।

তাহলে দেখা গেলো, আলোচিত হাদিসটির মধ্যে একজন রাবী হচ্ছেন - ইমাম জুহরী রাহঃ। আর পরবর্তীতে উনাকে এই হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, জানেন না।

সূত্র –

মুসনাদে আহমাদ ৭/৭২

সূনানে তিরমিজি ৩/৪১

শারহু মা'আনিয়াল আছার লিত্তাহাবী ৩/৮

মা'আলিমুস সুনান লিখাত্তাবী ২/৫৬৭

আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি ৭/১০৬

(একাধিক সূত্র রয়েছে, সুতরাং ইমাম জুরাইহ রাহঃ এর প্রশ্ন নিয়ে যেন কোন সন্দেহ না থাকে)

তাহলে আপনারাই বলুন - আমরা উপরে যে ' খবরে ওয়াহিদ হাদিস' গ্রহণ করর মূলনীতি জেনেছি, তার আলোকে কি এই হাদিসকে গ্রহণ করা যায় ?

সুবহানাল্লাহ !

হাদিসটা হাসান পর্যায়ের । দেখা মাত্রই যে কেউ গ্রহণ করার মতো ; কিন্তু এর ভিতরে যে কত বড় সুক্ষ্ম বিষয় নিহিত আছে __ তা কয়জনে জানতেন ?

শেষ আপনারাই বলেন , হানাফী মাজহাবে এই হাদিসটি গ্রহণ না হওয়া কি একেবারে অ-মৌলিক হয়েছে ? অন্যায় হয়েছে ? নাকি বলবেন, আবু হানিফা রাঃ এর কাছে এই হাদিসটি পৌঁছে নাই ?

আলাহু আকবার!

কি করে আপনারা এসব তুহমত দিতে পারেন ? আবু হানীফা রাহঃ এর কাছে যদি হাদিসটি নাই বা পৌঁছে থাকে, তাহলে এই হাদিসের রাবী'র সুক্ষ্ম বিষয় নিয়ে কিভাবে আলোচনা করলেন ?

ফি আমানিল্লাহ !

কোর'আন- হাদিস কিভাবে পড়বেন ?

Details

আলহামদলিল্লাহ , অত্যন্ত প্রশান্তি লাগে যখন দেখি আমাদের দেশে দলে দলে অসংখ্য তরুণ ভাইয়েরা দ্বীনের পথে প্রেক্টিসিং চলা শুরু করেছেন। এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দ ও আশার ব্যাপার ! দোয়া করি, আল্লাহ তা'লা যেন আমাদের দেশের তরুণ ভাইদেরকে আরো প্রেক্টিসিং মুসলিম হওয়ার তাওফীক দান করেন - আমীন!

কিন্তু, মাঝেমধ্যে একটা উদ্বিগ্নের ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। যারাই প্রেক্টিসিং ইসলামে যাত্রা শুরু করেন, তাদের অধিকাংশ শিক্ষিত সংখ্যা নিজে নিজে কোরআন-হাদিস পাঠে উৎসাহী ও আগ্রহী হচ্ছেন।

এর পিছনে হয়ত নির্দিষ্ট একটা গ্রুপের অবদান কাজ করছে। তারা যুবকদেরকে তা'লিম দিচ্ছেন, বাংলা বুখারী আছে মার্কেটে। ক্রয় করে নিজে নিজে স্টাডি করুন ! মাদ্রাসায় যাওয়ার দরকার নাই। শিক্ষক ধরার প্রয়োজন নাই। ইলম-কালাম ইন্টারনেটে ভরপুর। সেখান থেকে শিখে নিন। ইসলাম কখনো কোন মাদ্রাসায় বন্ধি নয় বা কোন শায়খের কাছে জব্দ নয় !

এরকম উৎসাহ ব্যঞ্জক আলোচনা থেকে আমাদের কিছু তরুণ ভাইয়েরা মার্কেট থেকে বাংলা বুখারী কিনে মোটামুটি ব্যক্তিগত পড়াশোনা চালু করেন। এটা আংশিক বিবেচনায় ভালো দিক হলেও বৃহৎ চিন্তায় মোটেও ঠিক না। এতে দ্বীনের পথে চলার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এবং গোমরাহির পথ খুলে যাবে।

কারণ, কোরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জন ফরজ আর কার থেকে শিক্ষা নিবেন _ এটা দ্বীনের এক অংশ। দ্বীনের জ্ঞান কখনো কেউ একা একা সঠিকভাবে অর্জন করতে পেরেছে, এমন ইতিহাস নাই। তাই, আমি আজকের লেখায় দ্বীনের জ্ঞানার্জন এর ক্ষেত্রে শিক্ষক / শায়খ এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

দ্বীনের জ্ঞানার্জন কেন শায়খ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে? এর পিছনে একটা যৌক্তিক ও আরেকটা দালিলিক কারণ উল্লেখ করছি -

১. যৌক্তিক কারণ -

আমরা দেখতে পাই, ইতিহাসে কোন মুহাদ্দিস বা দ্বীনি বিদ্বান নিজস্ব পড়াশোনায় মুহাদ্দিস / মুফাসসীর / মুফতি হন নাই। তাঁরা কোন না কোন শায়খের সান্নিধ্যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছেন।

যেমন -

√ রাসূলের উস্তাদ ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা। জিবরাইল আঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন।

√ সাহাবাদের উস্তাদ ছিলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাহাবারা রাসূলের হালকায়ে দারসে তাশরীফ নিতেন। সরাসরি প্রশ্ন করতেন আর এভাবে দ্বীনের শিক্ষা নিয়েছেন।

√ তাবেয়ীগণ সাহাবা থেকে সরাসরি দ্বীনের জ্ঞানার্জন করেছেন। তাবেয়ীদের যুগ থেকে পৃথক পৃথক কোরআন, হাদিস ও ফিকাহের দারস সূচনা হয়।

√ মাজহাবের সম্মানীত ইমাম ও প্রসিদ্ধ আলেমগণ কোন না কোন শায়খ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। যেমন -

ইমাম আবু হানীফা আলকামা রাঃ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন

ইমাম মালেক রাঃ হাসান বাসারী থেকে শিক্ষা নিয়েছেন

ইমাম শাফী রাঃ মোহাম্মাদ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন

ইমাম আহমদ রাঃ আবু ইঊসূফ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন

ইমাম বুখারী রাঃ ইমাম আহমদ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন

ইমাম মুসলিম রাঃ বুখারী থেকে শিক্ষা নিয়েছেন

(তাদের হাজারো উস্তাদ আছেন। এখানে জাস্ট একটা উদাহরণ টানলাম ।)

এভাবে, ইতিহাসে অতিবাহিত হয়ে যাওয়া দ্বীনে ইসলামের সম্মানীত খাদেমগণ কোন না কোন শায়খ থেকে কোরআন/হাদিস/ফিকাহর জ্ঞান লাভ করেছেন। কেউ কখনো ঘরে বসে বসে জ্ঞানার্জন করেন নাই। বরং দ্বীনি জ্ঞানার্জনের জন্য বা শায়খ ধরার জন্য হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করেছেন।

২. দালিলিক কারণ -

সালাফদের বিভিন্ন কথা ও বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, কোরআন-হাদীসের জ্ঞানার্জন ফরজ । আর উস্তাদ ও শায়খ থেকে শিক্ষার্জন করা দ্বীনেরই একটা অংশ। যেমন ইমাম ইবনে সীরীন ও ইমাম*মালিক রা. বলেন,*

إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم

" নিশ্চয় এই জ্ঞান (কোরআন-হাদিসের) দ্বীনেরই একটা অংশ। লক্ষ করো, তোমরা কাদের থেকে তোমাদের দ্বীনি জ্ঞান নিচ্ছ "

সূত্র: আল-কিফায়াহ, খতীব বাগদাদী পৃ. ১২১, ১৫৯।

এ থেকে স্পষ্টত দু'টি বিষয় ক্লিয়ার হয় -

১. যে কেউ থেকে কোরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। বরং ঔই ব্যক্তি থেকে দ্বীনি জ্ঞান লাভ করা যাবে, যিনি -

√ কোরআন-হাদিসের জ্ঞানে পারদর্শী

√ মুত্তাকী ও পরহেযগার

√ ইলম অনুযায়ী আমলকারী

√ মিথ্যা / গীবত ইত্যাদি থেকে বিরত থাকেন।

২. দ্বীনী জ্ঞান কোন না কোন যোগ্য শায়খ থেকে শিখে নিতে হয়। কেবল এরা দুজন নয় ; এই মর্মে ইমাম আহমদ, ইউসুফ সহ প্রমূখ সালাফ থেকে বর্ণিত আছে যে, দ্বীনি শিক্ষা কোন না কোন মুত্তাকী ও পরহেযগার বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ আলেম থেকে শিখে নিতে হয় ।

এ হচ্ছে ইতিহাস পর্যালোচনার কথা। এবার আসি, বাংলাদেশ ছাড়া আরব বিশ্বে কিভাবে বুখারীর দারস হয়ে থাকে। আমি যেহেতু সৌদি আরব থাকি, তাই এখানকার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে বলি।

স্বভাবতই ভাষাগত কারণে আমরা তাদের থেকে কোরআন-হাদিসের জ্ঞানে সার্বিক বিবেচনায় পিছিয়ে আছি। কোরআন-হাদিসের ভাষাই তাদের মাতৃভাষা। সুতরাং, তারা চাইলে সহজে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে। চাইলে তারা ঘরে বসে বসে একাকী পড়ে অনেক বড় মুফতি / মুহাদ্দীস / মুফাসসির হতে পারে।

কিন্তু, বাস্তব সত্য জানেন কি ?

তাদের দেশের শায়খরা তাদেরকে ঘরে বসে বসে মার্কেট থেকে বুখারী ক্রয় করে একা পড়তে উৎসাহীত করেন না। তাই আরবের আপামর তাওহিদী জনতা কোরআন-হাদিসের দারস হয়তো একাডেমিক গ্রহণ করে থাকে, নতুবা কোন না কোন শায়খ থেকে ব্যক্তিগত শিক্ষা লাভ করে থাকে।

একটা প্রমাণ উল্লেখ করি -

আপনারা যারা উমরাহ/ হজ্জ্ব করতে আসেন, তারা দেখতে পাবেন মক্কা বা মদিনার হারামে বা বিভিন্ন মসজিদে হালকায়ে দারস হচ্ছে। এসব দারসে সম্মানীত শায়খরা বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক দারস দিচ্ছেন আর সামনে থাকা যুবক-বৃদ্ধ শ্রোতা কানপেতে শুনছেন। অর্থাৎ, যারা একাডেমিক পড়ে নাই, তারা কোরআন-হাদিসের জ্ঞান একা একা ঘরে বসে না শিখে হারামে এসে বিভিন্ন শায়খ থেকে শিখে নিচ্ছেন। এছাড়াও, হারামের বিভিন্ন কর্ণারে বিভিন্ন সময় দেখা যায়, একজন শায়খ ও একজন ছাত্র গভীর মুতা'লায় ব্যস্ত। অর্থাৎ, দ্বীনের তালিবে ইলম তার পছন্দনীয় শায়খ থেকে একাকী দারস নিচ্ছেন।

ছোট্ট একটা উদাহরণ বলি,

যারা আমাদের প্রেক্টিসিং মুসলিম ভাইদেরকে বাংলা বুখারী কিনে একাকী পড়ার পরামর্শ দেন, তাদের জ্ঞাতার্থে খোদ ইমাম বুখারী রাঃ তার অনবদ্য গ্রন্থ " সহীহ আল-বুখারী " সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বলছি -

ইমাম বুখারী রাঃ স্বয়ং তার শায়খ / উস্তাদ সংখ্যা বর্ণনায় নিজে বলেন -

كتبت عن ألف و ثمانين رجلا ليس فيهم إلا صاحب الحديث

" আমি এক হাজার আশিজন শায়খ থেকে হাদিস লিখেছি। যাদের সবাই হাদিস বিশেষজ্ঞ। "

সূত্র : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা - ৩৯৫

এ তো গেলো উনার শায়খ সংখ্যা। এবার দেখা যাক, উনার ছাত্র সংখ্যা কতো বা কতজন মুহাদ্দিস উনার থেকে হাদিস শিক্ষা নিয়েছেন -

ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরী রাঃ ইমাম বুখারীর শিষ্য সংখালোচনায় বলেন -

سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل

অর্থাৎ " ইমাম বুখারী রাঃ এর অনবদ্য গ্রন্থ " কিতাবুস সাহীহ বা সাহীহ বুখারী " তার থেকে নব্বই হাজার লোক শ্রবণ করেছেন। "

চিন্তা করুন, যে বুখারীকে মার্কেট থেকে কিনে একাকী পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, সেই বুখারী গ্রন্থই সম্মানীত লেখক তথা ইমাম বুখারী এক হাজার আশিজন থেকে সংগ্রহ করেছেনে এবং তা থেকে প্রায় নব্বই হাজার লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

এবার আলোচনা করব একাকী স্টাডির নেতিবাচক এবং কোন শায়খ থেকে শিক্ষা নেওয়ার ইতিবাচক দিক নিয়ে -

আপনি একাকী স্টাডি করলে যেসব শূন্যতা ফীল করবেন -

১. একটা সুন্নাহ ও সালাফের আমল থেকে বঞ্চিত থাকবেন

২. হাদিসের মান নির্ণয়ে বিপাকে পড়বেন

৩. হাদিসের মধ্যকার তা'আরুজ নিয়ে বিশাল ঝামেলায় পড়বেন

৪. নাসিখ-মানসুখ না জানা থাকায় বিরাট সমস্যায় পড়বেন

৫. শয়তানি ওয়াসওয়াসায় সবসময় ভোগবেন

কোন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ শায়খ থেকে শিক্ষা নিলে যা উপকৃত হবেন -

১. একটা সুন্নাহ এর উপর আমল হবে

২. সালাফদের দেখানো পথ অনুসরণ হবে

৩. কোনটা সহীহ-জইফ জানতে পারবেন

৪. নাসেখ-মানসুখ আয়াত ও হাদীস জানতে পারবেন

৫. হাদীসের আনুষাঙ্গিক আলোচনা জানতে পারবেন

৬. তাআরুজ হাদিসে তারজীহ কোনটি তা জানতে পারবেন

৭. হাদিস সংশ্লিষ্ট মাসালা জানতে পারবেন

৮. বিভিন্ন রাবীদের সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারবেন

৯. দ্বীনের তালিবে ইলম এর প্রকৃত মর্যাদা পাবেন

১০. আপনার দ্বীনি শিক্ষার সিলসিলা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন।

প্রিয় দ্বীনি ভাইয়েরা,

আপনারা দ্বীনি কাজে আগ্রহী হচ্ছেন, দ্বীনি জ্ঞানার্জনে অগ্রবর্তী হচ্ছেন- এটা আমাদের জন্য বড় খুশীর সংবাদ। আমরা চাই, আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টা সালাফদের কাজের সাথে মিল হোক। তাই, সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে, মার্কেট থেকে বাংলা বই কিনে একাকী পড়াশোনা না করে নিজের পছন্দ মোতাবেক আশপাশের কোন গ্রহণযোগ্য শায়খ থেকে দারস গ্রহণ করবেন। অথবা সময়-সুযোগ না হলে একাকি পড়েন, তবে অন্তত দূরবর্তী হলেও একজন দ্বীনি মেন্টর মেনে পড়ার চেষ্টা করবেন এবং যাস্টিফাই করে নিবেন । এতে আপনার প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণতা পাবে এবং আপনি একজন পূর্ণাঙ্গ তালিবে ইলম এর মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ ।

মাসালা জানার জন্য কি পড়বেন ?

Details

ইসলামী বিধানে চলার পথে প্রতিটা পদে পদে মাস'আলা-মাসাঈল জেনে চলতে হয়। তাই তো আমরা কেউ সরাসরি কোরআন-হাদীস পড়ি, আবার কেহ ফিকহী কিতাব অধ্যায়ন করি।

প্রসঙ্গ আলোচনা হচ্ছে - একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য মাসালা-মাসাইল জানতে কোনটি বেশী নিরাপদ ? সরাসরি কোর'আন-হাদিস নাকি ফিকহী কিতাব ?

(আমি আগেই বলে রাখি, কোরআন-হাদিস সাধারণ অধ্যায়নে সওয়াব বা প্রয়োজনীয়তার বিকল্প নাই। আমি এখানে জাস্ট, মাসালা-মাসাইল বুঝার জন্য কোনটি বেশী নিরাপদ, তা নিয়ে আলোচনা করছি।)

বিষয়টি নিয়ে খোলাসা করার পূর্বে হাদিস ও ফিকহী কিতাবের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরা জরুরি মনে করছি -

হাদীস গ্রন্থঃ -

যেখানে সকল ধরণের হাদিস সন্নিবেশিত করা হয়। সহীহ, জঈফ, রাসূলের জন্য খাস, নাসেখ-মানসুখ সহ যাবতীয় হাদীস সংগ্রহ করা হয়। কোনটা আমলের প্রযোজ্য, কোনটি প্রযোজ্য নয়- এমন কিছুর বিবরণ হাদিস গ্রন্থাবলীতে সাধারণত পাওয়া যায় না।

ফিকহী গ্রন্থঃ -

জীবনে চলার পথে প্রতিটা পদে পদে প্রয়োজনীয় সকল মাসালা-মাসাইল দলীল-প্রমাণ সহ উপস্থাপিত থাকে। ইবাদাত, মো'আমালাত, হুদুদ ইত্যাদি পার্ট পার্ট সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো থাকে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হাদীসটির দলীল দিয়ে মাসালা-মাসাইল সাজানো হয়ে থাকে।

উভয়টির সারসংক্ষেপ দাঁড়ায় -

হাদিসের কিতাব পড়লে একজন সাধারণ মুসলিম জানতে পারে না, কোন হাদিসটি আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর কোন হাদিসটি প্রযোজ্য নয়।

তবে, ফিকহি কিতাব পড়লে একজন সাধারণ মুসলিম সহজেই বুঝতে পারবে যে, আমলের ক্ষেত্রে কোন হাদিসটি প্রযোজ্য । কেননা, ফোকাহায়ে কেরাম বিপুল পর্যালোচনার পরে নাসেখ-মানসুখ তফাৎ করে আমলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য হাদিস'টি মাস'আলায় বর্ণনা করে থাকেন।

তাহলে, আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, যারা লক্ষ লক্ষ হাদিসের নাসেখ-মানসুখ ইত্যাদি নিয়ে ধারণা রাখেন, তারা কেবল সরাসরি হাদিস পাঠ করে মাসালা-মাসাইল জেনে তার উপর আমল করতে পারেন। আর যারা সাধারণ মুসলিম ; তাদের জন্য ফিকহী কিতাবাদী পড়া আবশ্যকীয় ।

কেননা একজন সাধারণ মুসলিম জানে না -

১ - কোনটা হাদিস আর কোনটা সুন্নাহ!

১ - কোনটার হুকুম রহিত হয়ে গেছে বা বাকি আছে।

৩ - কোনটা নাসিখ আর কোনটা মানসুখ।

৪ - হাদিসের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয় জানে না।

এছাড়াও অনেক বিষয় আছে হাদীসে, যা একজন সাধারণ মুসলিম কস্মিনকালেও জানতে পারে না। সুতরাং, কেবল মাসলা-মাসাইল জানার জন্য একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য ফিকহী কিতাবাদী পড়া অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও নিরাপদ বটে।

এবার আপনাদের সামনে হাদীসের নাসেখ-মানসুখ নিয়ে যৎসামান্য আলোকপাত করি -

মানসুখ - যে হাদিসের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে

নাসেখ - যে হাদীস একটি হুকুম রহিত করে নতুন কোন হুকুম নিয়ে এসেছে

প্রশ্ন হতে পারে -

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসে কি এভাবে নাসেখ-মানসুখ আছে ? জ্বী, হ্যাঁ ! এরকম অনেক হাদীস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসে কি এভাবে নাসেখ-মানসুখ আছে ? জ্বী, হ্যাঁ ! এরকম অনেক হাদীস আছে ; যার হুকুম পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়। যা মোহাদ্দিসীনে কেরাম আবিস্কার করেছেন বা কিছুটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বা বিপরীত আমল করে বুঝিয়েছেন।

হাদিসের নাসেখ-মানসুখ বুঝার কিছু মূলনীতি -

১ - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রথম দিকে একভাবে আমল করেছেন, পরবর্তীতে অন্যভাবে করেছেন।

২ - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে একভাবে বলেছেন, পরে অন্যটি বলেছেন।

৩ - রাসূলঃ একভাবে বলেছেন, তবে আমল ভিন্নভাবে করেছেন।

৪ - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একভাবে বলেছেন, সাহাবাগণ অন্যভাবে আমল করেছেন।

এছাড়াও, আরো অনেক মূলনীতি আছে, যার আলোকে পরিস্কার হয়, হাদিসের নাসেখ-মানসুখ ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসের নাসেখ-মানসুখ নিয়ে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম হাফীজ ইবনু শাহীন (৩৮৫ হিঃ) রাহিমাহুল্লাহ ! বইটিতে তিনি ৬৬৬ হাদিস সন্নিবেশিত করেছেন, যেসব হাদীস আমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, তবে হুকুম বাকি নেই। অর্থাৎ, উম্মাহ এর উপর আমল করতে পারবে না।

সর্বশেষ, আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই যে, একজন সাধারণ মুসলমানের জন্য কখনো সরাসরি হাদিস পড়ে মাসালা-মাসাইল জানা সম্ভব না ; যদি না সে পাশাপাশি ফিকহি কিতাব পড়ে।

হাদিসের কিতাবে আছে -

ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.

সহীহ সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ " যে ব্যক্তি মদ পান করবে, তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি সে পূনরায় মদ পান করে এমনকি চারবার করে ফেলে, তাহলে তাকে হত্যা করো। "

ফিকহী কিতাবে আছে -

ফিকহী কিতাবে আছে -

কোন ব্যক্তি যদি মদ পান করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। একই কাজ বারবার করলে, তাকে পুণরায় বেত্রাঘাত করা হবে। কখনো হত্যা করা যাবে না।

আপনি যদি একজন সাধারণ মুসলিম হোন এবং উপরে বর্ণিত হাদিস'টি পড়েন তাহলে বলবেন, বারবার মদ পানের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ! কিন্তু, যদি দেখেন কোন মুফতী ফতোয়া দিচ্ছেন যে, বারবার মদ্যপানে মৃত্যদণ্ড শাস্তি দেওয়া যাবে না, তাহলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে ?

নিশ্চিত বলবেন, এই মুফতি হাদীস জানেন না। জানলেও মানেন না। এই মুফতী সাহেব অন্ধ তাকলীদ করেন। এই মুফতী সাহেব মাজহাব পুজারী। এই মুফতী সাব... আরো কতো কিছু হয়তো বলবেন !

বস্তুত, আপনি একজন সাধারণ মুসলিম মোটেও জানেন না যে, এই হাদিস'টা মানসুখ তথা এই হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। এটার উপর আর আমল চলবে না।

ইমাম নববী রাঃ মুসলিম শারীফের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেন -

" এই হাদীসটা মানসুখ হয়ে গিয়েছে। একজন মদ পানকারীকে কখনো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। বরং, যত বার মদ পান করবে, ততো বার তাকে বেত্রাঘাত করা হবে "

প্রিয় ভাই আমার,

মাজহাব নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি এই জায়গা থেকেই শুরু হয়। আমরা অনেকেই জানি না, হাদিসের নাসেখ-মানসুখ। অথচ, ডিরেক্ট পড়ে ফেলি বিশাল বিশাল হাদিসের গ্রন্থ!

আর যৎসামান্য ফিকাহর কিছু হাদিসের বিপরীত হলেই সহসা বলে ফেলি -

১ - আবু হানফী রাঃ তো হাদীস বিরোধী ছিলেন

২ - আবু হানীফা রাঃ এর কাছে তো হাদিস পৌঁছেই নাই

৩ - আবু হানীফা রাঃ কিয়াসকে হাদিসের উপর প্রাধান্য দিতেন।

আল-ইয়াজুবিল্লাহ !

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে জাহালত থেকে দূরে রাখেন এবং কোর'আন-হাদিসের প্রকৃত বুঝ দান করেন। আমিন !

ফতোয়া দেওয়ার মূলনীতি কি ?

Details

কেউ যদি কোর'আন বুঝতে চায় বা কোর'আনে পূর্ণাঙ্গ পারদর্শী হতে চায়, তাহলে তাকে প্রাথমিকভাবে অনুবাদ পাঠে মনোযোগ দিতে হবে। অনুবাদ পাঠকালে কোর'আনের বেশ কিছু দুর্বোধ্য বিষয় সামনে আসবে। তখন মনে হবে কেবল অনুবাদ'ই যথেষ্ট নয় বরং তাফসীর বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ আবশ্যকীয় পড়তে হবে। অতঃপর, তাফসীর গ্রন্থ অধ্যায়নকালে কিছু Terminology বা পরিভাষা দুর্বোধ্যতা আসবে কিংবা এমন কিছু আলোচনা আসবে, যা সহজে বোধগম্য হচ্ছে না। তখন আপনাকে তাফসীরের হাতিয়ার হিসেবে " উলূমুত তাফসীর " বা " তাফসীরের মূলনীতি " গ্রন্থ পড়তে হবে।

১

অর্থাৎ, আপনি যখন কোর'আনকে পরিপূর্ণ রুপে বুঝতে যাবেন, তখন আপনাকে পরম্পরায় অনুবাদ → তাফসীর → ও মূলনীতি আবশ্যকীয় পড়তে হবে। নতুবা, আপনার কোর'আন হৃদয়াঙ্গমে পরিপক্কতা আসবে না। এজন্য প্রতিটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে "কোর'আন ডিপার্টমেন্টে " অনুবাদ, তাফসীর এর পাশাপাশি উলুম কোর'আন বা কোর'আনের মূলনীতি গ্রন্থ মেজর বা আবশ্যকীয় সাব্জেক্ট হিসেবে পড়ানো হয়।

২.

আপনি যখন হাদিস স্টাডি করতে যাবেন, তখন ফার্স্ট লেভেলে অনুবাদ পঠনে মনযোগ দিবেন। পড়তে পড়তে এমন কিছু হাদিস সামনে আসবে, যার বাহ্যিক অর্থ আপনার বুঝে আসবে না। তখন বাধ্য হয়ে আপনাকে হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ পড়তে হবে। প্রতিটা হাদিসের ব্যাখ্যা অধ্যায়ন শেষ উক্ত হাদিসের মান ইত্যাদি নিয়ে বেশ পর্যালোচনা আসবে। সেগুলা আবার

আপনার বুঝতে চরম কঠিনতা পোহাতে হবে। তখন আবার আপনাকে " উলুমুল হাদিস " বা হাদিসের মূলনীতি ইত্যাদি পড়তে হবে।

অর্থাৎ, আপনি যদি হাদিসে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ করতে চান, তাহলে হাদিসের অনুবাদের পাশাপাশি হাদিসের ব্যাখ্যাও জানতে হবে। সর্বশেষ, পরিপক্কতার জন্য হাদিসের মূলনীতিও জানতে হবে। নতুবা, হাদিসের মান যাচাই-বাছাই ও পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার কায়দা না জানার কারণে ভুলভ্রান্তি চলে আসতে পারে। এজন্য প্রতিটা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে "হাদিস ডিপার্টমেন্ট " হাদিসের ব্যাখ্যার পাশাপাশি উলুমুল হাদিস বা হাদিসের মূলনীতি নামে একটা সাব্জেক্ট বাধ্যতামূলক রাখে।

৩.

আপনি যদি এবার ফিকাহ বুঝতে চান, তাহলে নির্ধারিত কোন মাজহাবের বা চার মাজহাবের মোকারানার পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে। ফিকাহ অধ্যায়ন কালে আপনি যখন প্রতিটা মাজহাবের দালিলিক পর্যালোচনা পড়বেন, তখন দেখবেন অনেক কথা চলে আসছে, যা আপনি আগে জানেন নাই। তখন বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হবে উসুলুল ফিকাহ বা ফিকাহের মূলনীতিতে (এযাবৎ আমার কাছে সবচেয়ে কঠিন সাব্জেক্ট মনে হয়েছে) । একজন ইমাম যখন কোন দলীল তারজীহ দেন, তখন তিনি উসূল বা মূলনীতিকে সামনে রেখেই দেন।

অর্থাৎ, আপনি যদি ফিকাহ এর পরিপূর্ণ জ্ঞান পেতে চান, তাহলে মাসালা-মাসাইল পাঠের পাশাপাশি উসুলুল ফিকহ বা ফিকাহের মূলনীতি বুঝতে হবে। নতুবা, একজন ইমাম কোন মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি দালিলিক আলোচনা করলেন, তা বুঝতে পারবেন না। আর না বুঝার কারণে মনে করবেন যে, আবু হানীফা রাঃ এখানে ভুল করেছেন ! আবু হানীফার কাছে হাদিস'ই পৌঁছেনি!! আবু হানীফা তো হাদিস'ই জানতেন না ! এক্সেট্রা....

এজন্য, প্রতিটা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকাহ ডিপার্ট্মেন্টে মাসালা-মাসাইল এর পাশাপাশি উসূলুল ফিকহ বা ফিকাহের মূলনীতি বাধ্যতামূলক পড়ানো হয়। আমাদের ডিপার্টমেন্টে তো পুরা বিশ্ববিদ্যালয় লাইফ'ই এই সাব্জেক্ট পড়ায় !

৪.

এবার আপনার কোর'আন, হাদিস ও ফিকাহ অধ্যায়ন সব শেষ। ইচ্ছা জাগলো, আপনি মুফতি হতে চান। তখন আপনার জন্য উপরোক্ত কোর'আন, হাদিস ও ফিকাহের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আরো গুরুত্বপূর্ণ দু'টা মানদণ্ড আয়ত্ত করতে হবে। তা হলো -

ক. কাওয়াইদে ফিকহিয়া (قواعد فقهية) বা ফিকহার নিয়মাবলি ভালো করে আত্মস্থকরণ করতে হবে। কারণ, বিশেষায়িত নিয়মের ভিত্তিতে অনেক মাসালার সমাধান করা হয়।

খ. মাক্কাসিদে শার'ঈয়াহ (مقاصد الشريعة) বা শারীয়ার উদ্দেশ্যনিহীত কথা নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা থাকতে হবে। নতুবা, সমসাময়িক যে কোন বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে আপনাকে দুর্বোধ্য পোহাতে হবে।

মোদ্দাকথায়, একজন বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ মুফতী হতে হলে আপনাকে কোর'আন, হাদিস ও ফিকাহের জ্ঞানের পাশাপাশি উপরোক্ত দু'টি বিষয় তথা " কাওয়াইদে ফিকহিয়া ও মাকাসিদে শারীয়া " সম্পূর্ণ জানতে হবে। এজন্য প্রতিটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ বা ইফতা বিভাগে কোর'আন, হাদিস, ফিকহের পাশাপাশি উপরোক্ত দু'বিষয় মেজর সাব্জেক্ট হিসেবে পড়ানো হয়।

৫.

ফতোয়া দিতে তার অন্যতম শর্ত হলো - মাক্কাসিদে শারীয়াহ জানতে হবে। কেবল, পূর্বেকার ইমামগণের মাসালা বলে দেওয়ার নাম'ই ফতোয়া না। বরং, পরিস্থিতি বিবেচ্যে মাকাসিদে শারীয়াকে সামনে রেখে কোর'আন-হাদিসের দালিলিক আলোচনার নাম'ই ফতোয়া।

যারা এক্সট্রিম মাজহাব অনুসরণ করেন, তারাও কখনো কখনো আপন মাজহাবের মত থেকে সরে আসতে হয়। কারণ, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্তে যেতে হয়। এতে উদ্দেশ্য হয় __ মাকাসিদুশ শারীয়া বা শারীয়ার উদ্দেশ্যকথা।

শেষ পর্বে, মাকাসিদে শারীয়াহ নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে এই বিষয়ে অনবিজ্ঞ থাকার কারণে অনেকেই এমনভাবে ফতোয়া দেন যে, সাথে সাথে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। বস্তুত, মাকাসিদে শারীয়াহকে সামনে রেখে ফতোয়া দিলে কখনো এমন বিতর্ক সৃষ্টি হতো না।

মাকাসিদে শারীয়াহ কি ? মাকাসিদে শারীয়ার প্রয়োজনীয়তা কি ? এই দু'টি বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করে লেখাটি সমাপ্ত করবো ইনশা আল্লাহ।

ক. মাকাসিদে শারীয়াহ কি ?

ইবনে রাজাব রাঃ বলেন - শরীয়ত প্রণেতা যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে হুকুম-আহকাম আরোপ করেছেন, তাই হচ্ছে মাকাসিদে শারীয়া। (১)

ইমাম শাতিবী রাঃ বলেন - সর্বসম্মত যে, শারীয়ত আমাদের উপর যে হুকুম-আহকাম আরোপ করেছে, তার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো, আমাদের ব্যাপক উপকার সাধন (ইহকাল-পরকাল) । আর এটাই হচ্ছে মাকাসিদে শারীয়াহ। (২)

খ. মাকাসিদে শারীয়াহ প্রয়োজনীয়তা কী ?

ইমাম শাতিবী রাঃ বলেন - মানুষ যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সে শারীয়াতের প্রতিটা ক্ষেত্রে শারে বা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যকথা বুঝতে পারে, প্রত্যেকটা হুকুম-আহকাম এর পিছনের রহস্য উদঘাটন করতে পারে। তাহলে সে এমন একটা গুণ অর্জন করলো, যার দ্বারা সে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। (৩)

এছাড়াও মাকাসিদে শারীয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ড. ফায়সাল বিন সাউদ (হাফিযাহুল্লাহ) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ (علم مقاصد الشريعة الإسلامية) তে উল্লেখ করেন-

১ - এটা এমন একটা ইলম, যার থেকে কখনো একজন মুজতাহিদ কিংবা মুফতি অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না। কারণ, মুজতাহিদ কিংবা মুফতি তার ইজতেহাদের ক্ষেত্রে মাকাসিদে শারীয়াকে সামনে রাখতে হয় । আর মাকাসিদে শারীয়াকে ঘিরেই ফতোয়া দিতে হয়। শারীয়ার খেলাফ মেজাজ কোন কথা কখনো গ্রহণযোগ্য না।

২ - এটা এমন একটা ইলম , যার দ্বারা প্রতিটা দালিল-আদিল্লার বাস্তবতা জানা যায়, উদ্দেশ্য বুঝা যায়। বিশেষত, বিরোধপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে মাকাসিদে শারীয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ।

৩ - এটা এমন একটি জ্ঞান , যার দ্বারা একজন ফিকাহ বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকের ফিকহী অভিজ্ঞতা দৃঢ় ও মজবুত হয়।

৪ - এটা এমন একটি জ্ঞান , যার দিকে প্রত্যেক বিচারক / প্রশাসক / অভিভাবক প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কারণ, তারা বিচার কার্যকালে মাকাসিদে শারীয়াহকে সামনে রেখে আম-মুফসিদাহ বাতিল করে আম-মুসলিহাহ প্রতিষ্ঠা করতে হয় ।

৫ - এটা এমন একটা ইলম , যার দ্বারা আল্লাহর উপর ইয়াকীন-বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বুঝা যায়। (৪)

এছাড়াও, মাকাসিদে শারীয়ার আরো বেশ কিছু প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতা তুলে ধরেন, যার থেকে একজন দ্বীনি লেভেলের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না। বিশেষত, যারা দাওয়াতি ময়দানে কাজ করেন এবং সমাজে ফতোয়া দেন, তাদের জন্য মাকাসিদে শারীয়া পড়া জরুরী, যা না পড়লে নয় !

খিতামাল মিসক, দীর্ঘ আলোচনা পড়ে অনেকে বিব্রত হয়ে বলতে পারেন যে, দ্বীন সহজ। বাংলা অনুবাদ আর এপ্লিকেশন এর মাধ্যমে হাদিস পড়লেই তো ফতোয়া দেওয়া যায়। এসব আবার কী ? রাসূল তো কোর'আন-হাদিস মানতে বলেছেন। এসব নয় ?

ভাইদের একটা কথা বলবো, বক্ষমান লেখায় যেসব বিষয়ের আলোচনা এসেছে, তার একটাও কোর'আন-হাদিসের বাহিরে কিছু নয়। বরং, কোর'আন-হাদিসকেই পরিপূর্ণ জ্ঞানে বুঝতে এতোসব আয়োজন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান !

ইসলামি আইন কয়ভাগে বিভক্ত ?

Details

ফোকাহায়ে কেরাম ফিকাহ বা ইসলামী আইনকে চার ভাগে বিভক্ত করেন -

১. ইবাদাত। যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি।

২. মু'আমালাত ইনসানিয়্যাহ। যেমনঃ বিবাহ, তালাক ইত্যাদি।

৩. মু'আমালাত মালিয়াহ। যেমনঃ ক্রয়বিক্রয়, ব্যাংক ইত্যাদি।

৪. মু'আকাবাত। যেমনঃ হুদুদ, জেল, শাস্তি ইত্যাদি।

একজন তরুণ প্রফেসার সাহেব আমাদের ক্লাসে এসে লেকচার শুরু করে উপরোক্ত চার প্রকারের বিষয়টি পরিস্কার করলেন। এবং বললেন -

" তোমরা এ যাবৎ প্রথম দু'প্রকার তথা ইবাদাত ও বিবাহ-তালাক নিয়ে বিস্তারিত আইন-কানুন জেনেছো। এই সেমিস্টারে তোমরা জানতে যাচ্ছ, বিজনেস কনসেপ্ট / কারেন্ট বিজনেজ পলিসি / ব্যাংকিং এন্ড ফিনেন্স ইত্যাদি সহ সমসাময়িক সকল ব্যবসায়ীক ধারণা ইত্যাদি। এসবের সকল শারয়ী সমাধান জানতে যাচ্ছ" ।

তবে, তোমরা কেয়ারফুল ! ইবাদাত / বিবাহ /তালাক ইত্যাদিতে কোরআন-হাদিসের সরাসরি অধিকাংশ প্রামাণ্য পেলেও এই চাপটারে এতো কিছু পাবে না। বরং, অল্প কিছু সংখ্যাক মূলনীতি আছে - যা চার মাজহাবের ফোকাহায়ে কেরাম আবিস্কার করে গিয়েছেন - সেগুলোর উপর নির্ভর করে পুরা ব্যবসা-পলিসি জানতে হবে।

তিনি আরো বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা সাহাবায়ে কেরাম এর যুগে যে ব্যবসা পদ্ধতি ছিল, তা এখনকার ব্যবসার সাথে অনেকটার মিল নাই। তাই সরাসরি কোন প্রমাণ কোরআন-হাদিস থেকে খুঁজে পাবে না। তবে কিছু মূলনীতি আছে, যার আলোকে শারয়ী সমাধান দিতে পারো। "

আর মূলনীতি হলো চারটি -

١- الأصل في البيع: الحل

٢- العبرة في العقود: المقاصد والمعاني

٣- الأصل في الشروط: الإباحة

٤- الخراج عن الضمان

তরুণ প্রফেসার পুরা দু'ঘন্টা এই চার মূলনীতির উপর আলোচনা রেখে বলিষ্ঠ কন্ঠে বললেন -

" তোমরা কখনো ফোকাহায়ে কেরাম ছাড়া স্বয়ংক্রিয় হতে পারো না। তাঁদের দেখানো বা রেখে যাওয়া মূলনীতি ছাড়া বর্তমান বিজনেস পলিসির শারয়ী সমাধান দিতে পারো না । তাই মাজহাবের ফোকাহাদের মূলনীতি আগে ভালো করে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করো। তারপর, শাখাগত মাসালা-মাসাইল নিয়ে অগ্রসর হও। "

নীতিকথা -

সুবহানাল্লাহ !

আমি ফিকাহ বা ইসলামিক আইন যতো পড়তেছি, ততো বেশী প্রতিটা মাজহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হচ্ছি। যতো জানি, ততো মাজহাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যতো মাজহাবের উসূল বা মূলনীতি নিয়ে গবেষণা করি, ততো মাজহাবের প্রতি আশ্চর্যবোধ করি !

অথচ, যখন আমাদেরই কিছু দ্বীনি ভাই মাত্র ইবাদাতে কয়েকটা সহীহ হাদিসের দোহাই দিয়ে পুরা মাজহাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন কিংবা মাজহাবকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান ; তখন বুকে খুব কষ্ট ও মনে আফসোস লাগে। আপাততঃ মেনে নিলাম, কেবল সহীহ হাদিস মানতেই হবে ! মাজহাব মানা যাবে না। মাজহাব বলতে কিছু নাই।

তাহলে আমার প্রশ্ন হলো -

সহীহ হাদিস বা অধিকাংশ সরাসরি কোর'আন-হাদিসের নাস দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হলো শুধু - ইবাদাত। এছাড়া, নিকাহ / তালাক / ব্যবসা / ব্যাংকিং /শাস্তি ইত্যাদিতে প্রায় মাসালায় দেখা যায় সরাসরি কোন দলিলই নাই। ফিকহের মূলনীতি, ইজতিহাদ, কিয়াস ইত্যাদি মেনে সমাধান দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে আপনারা - যারা মাজহাব অস্বীকার করেন বা মাজহাবকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখান - কি করেন ?

আমরা তো মোটামুটি পার হয়ে যাই। কারণ, মাজহাবের সম্মানীত ইমামগণ উম্মাহর চিরন্তন ফায়দা বা ফেতনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক মূলনীতি তৈরি করে গিয়েছেন, আমরা সেগুলোকে ফলো করে সমাধান পেয়ে যাই। এ ক্ষেত্রে আপনারা কার দিকে তাকিয়ে থাকেন ?

আমাদের যেসব ভাইয়েরা গাইরে মুকাল্লিদ দাবী করেন, তারা বস্তুত মাজহাবটাকে বা তাদের পড়াশুনাকে কেবল ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। ফলে কে রাফয়ে য়াদাইন করলো না / কে আমীন বলল না / কে ফাতিহা পড়লো না --- এ নিয়ে ঝগড়াঝাটির শেষ নাই। এজন্যেই অনেককে শুধু সালাত নিয়ে বই লিখতে ও আলোচনা করতে দেখা যায়।

অথচ, মাজহাব তো কেবল ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়াবলির জন্য আসে নাই। বরং, বর্তমান বিজনেস ইত্যাদি যতো বিষয়াবলিতে সরাসরি কোন নাস বা কোরআন-হাদিসের দলীল নাই, সেগুলোর কিয়াসী বা মূলনীতির আলোকে সু-স্পষ্ট সমাধানকল্পে মাজহাব এসেছে। যেসব বিষয়ে সরাসরি নস/ দলীল এসেছে, সেগুলোর জন্য মাজহাব আসে নাই । বরং, মতভেদপূর্ণ বিষয় বা দলীলের অনুপস্থিত - এমন বিষয়ে ইজতিহাদী সমাধান নিয়ে মাজহাব এসেছে। আল্লাহ আমাদের ভাইদেরকে সঠিক বুঝার তাওফীক দান করুক !

সৌদি আরবে কি হানাফী মাজহাবের আলিম আছেন ?

Details

অনলাইন জগতে যতো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, তন্মধ্যে এটি একটি কমন প্রশ্ন ছিলো - সৌদি আরবে কি হানাফী মাজহাবের আলিম-উলামা আছেন ??

এর একটা বিহিত কারণ অবশ্যই আছে। আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হানাফী মাজহাব অনুসরণ-অনুকরণ করেন। আরেকটু ক্লিয়ার করে বলি, মূল এবং মৌলিক হানাফী মাজহাব ফলো করেন। নতুন হানাফী বা মূল হানাফী থেকে দূরবর্তী কোন নব্য আবিস্কৃত হানাফী মাজহাব অনুসরণ করা হয় না।

যাহোক, কিছু সংখ্যাক শায়খ আছেন, যারা বিভিন্ন সময় সৌদি আরবের রেফার করে খেয়ে না -খেয়ে হানাফী মাজহাবের বিরুদ্ধাচারণে লেগে থাকেন। এতে জনমনে প্রশ্ন জাগে যে, সৌদি আরবে কি হানাফী মাজহাবের আলিম-উলামা নেই ? থাকলে উনারা (!) এতো হানাফী বিদ্বেষী হোন কি করে ?

কিছু শায়খের বিরোধিতা ও হানাফী মাজহাব নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা এতই যে, সাধারণ মানুষের মনে এমন প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার!

যাহোক, আমি আজকের লেখায় খানিকটা জানান দেওয়ার চেষ্টা করবো যে, সৌদি আরবে হানাফী মাজহাবের আলিম-উলামা আছেন কি না!

প্রথমত দু'টি কথা -

১. সৌদি আরবে রাষ্ট্রিয় রসমি বা প্রতিষ্ঠিত মাজহাব হচ্ছে - হাম্বলী মাজহাব। দেশটির প্রত্যেক মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ বলতে হাম্বলী মাজহাবই পড়ানো হয়।

জ্বী, আরেকটু ক্লিয়ার করে বলি - দেশটিতে সু-নির্ধারিত একটা মাজহাবই তথা হাম্বলী মাজহাব পড়ানো হয়। এমনকি, উসূলুল ফিকহও কেবল হাম্বলি মাজহাবের পড়ানো হয়। বেশী দূর যাওয়ার দরকার নাই। ধরুন, আমাদের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এর কথা।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীয়া বিভাগে (ফিকাহ) একাট্টা হাম্বলী মাজহাবের বই পড়ানো হয়। ফিকাহের বই হচ্ছে -

" আর-রাওজুল মুরবীঈ "

বইটি হাম্বলী মাজহাবের একক প্রসিদ্ধ মতন-গ্রন্থ (মাজহাবের মূল ট্যাক্সট বই) জাদুল মুস্তাক্বনা' এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ, যা সকল শ্রেণীর ফিকাহ-শিক্ষার্থীদের কাছে জানা । তদুপরি, বইটি নিয়ে কারো সন্দেহ থাকলে নিচের লিংকে ক্লিক করে বিস্তারিত জানতে পারেন -

লিংক - shorturl.at/ktU08

২. সৌদি আরবের রাসমি বা প্রতিষ্ঠিত মাজহাব যেহেতু হাম্বলি এবং পাশাপাশি কোর্টকাছারিতেও এই মাজহাব অনুসরণ হয়, সেই হিসেবে ভিন্ন মাজহাব রাসমিভাবে প্রতিষ্ঠা হওয়া অনেকটা ইস্পাত-কঠিন। কারণ, এক সাথে একাধিক মাজহাব একজন ব্যক্তি যেভাবে অনুসরণ করতে পারে না, তেমনিভাবে একটা রাষ্ট্রের জন্য একাধীক মাজহাব রাসমি হতে পারে না। একাধিক মাজহাব রাসমি হলে, কি যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা বোধ হয় ফিকাহর নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারবে।

যাহোক, সৌদি আরবে হাম্বলী মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হলেও অন্যান্য প্রসিদ্ধ তিন মাজহাবের আলিম-উলামা ও মাদারিস অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। অনেক বড় বড় মাশায়েখও রয়েছেন।

সৌদি আরবে মাজহাবের বিচিত্র ইত্যাদি জানতে নিচের আল-জাজিরার রিপোর্ট পড়ে নিতে পারেন। আমার কাছে অত্যন্ত রিলায়াবল মনে হয়েছে -

সূত্রঃ- shorturl.at/nEY15

আমার এই পোস্টে যেহেতু সৌদি আরবে হানাফী আলিম-উলামার সন্ধান দেওয়া উদ্দেশ্য, সেহেতু অন্যান্য মাজহাবের ব্যাপারে তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকলাম।

এবার আসি মূল আলোচনায় - সৌদি আরবে কি হানাফী মাজহাবের আলিম-উলামা আছেন?

এক কথায় - জ্বী, হ্যাঁ !

সৌদি আরবে অসংখ্য হানাফী মাজহাবের আলিম-উলামা আছেন এবং নির্ধারিত হানাফী ফিকহের মাদ্রাসাও রয়েছে।

বক্ষমান লেখায় সৌদি আরবের মতো বিশাল রাষ্ট্রের সকল হানাফী উলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসা সমূহ এক সাথে তুলে ধরা আমার জন্য সম্ভব না। তাই, মাত্র একটা হানাফী ঐতিহ্যবাহী পরিবারের ফিরিস্তি তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ !

এর পূর্বে বলে রাখা বাহুল্য যে, পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফ প্রাঙ্গণে মসজিদে হারামুল মাক্কাতে শায়খ মাক্কী আল- হিযাজী প্রায় চল্লিশ বছর থেকে নিয়মিত দারস প্রদান করে আসছেন। তিনি একজন খ্যাতিমান হানাফী স্কলার বা আলিম। উনার হাজারের উর্ধ্বে আরবী, উর্দু ও ইংলিশ লেকচার ইউটিউবে আছে। আরো বলা বাহুল্য যে, উনার প্রতিষ্ঠিত মক্কাতে হানাফী ফিকহের মাদ্রাসাও রয়েছে।

শায়খকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটা ডকুমেন্টারি - https://youtu.be/IMo4p16arT0

যাহোক, সৌদি আরবের প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ একটা জেলা হচ্ছে - আহসা, যা রাজধানী রিয়াদ থেকে পূর্ব দিকে রয়েছে। এই জেলাতে জন্ম নিয়েছেন সৌদি আরবের অসংখ্য আলিম-উলামা। সবচেয়ে মজার তথ্য হচ্ছে, এই প্রভিন্সে চার মাজহাবের আলিম-উলামা ও সকলের সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। এমনকি বিভিন্ন মাজহাবের স্বতন্ত্র হালকা/মাদারিসও রয়েছে।

সেই " আহসা " অঞ্চলের একটা প্রসিদ্ধা হানাফী পরিবার হচ্ছে - আলে মোল্লা পরিবার, যারা বছর বছর ধরে ইলম, আমল ও তাজকিয়া লাইনে সৌদি আরবে সমৃদ্ধি ও খ্যাতী লাভ করে আসছেন।

এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য আলিম-উলামা , যারা প্রত্যেকেই হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত স্কলার ছিলেন। দারস-তাদরীসের পাশাপাশি হানাফী মাজহাবের উপর বিভিন্ন বই-পুস্তক লিখে পুরা মুসলিম বিশ্বে পরিবারটি সু-খ্যাতী অর্জন করেছে ।

ঐতিহ্যবাহী " আল-মোল্লা " এই হানাফী পরিবারের কয়েকজন খ্যাতিমান স্কলার এর নাম ও তাদের দ্বীনি লাইনের খেদমত তুলে ধরছি -

উল্লেখ্যঃ নিম্নে বর্ণিত সকল শায়খ হানাফী মাজহাবের অনুসারী ও খ্যাতিমান স্কলার ছিলেন।

১. শায়খ আলি বিন হুসাইন আল- ওয়াইজ আ-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । উনার নামানুসারে পরবর্তীতে সেই পরিবারের নাম হয়ে যায় " উসরাতু আলে-মোল্লা ", যা পুরা পৃথিবী জুড়ে প্রসিদ্ধ। তিনি তৎকালীন সময়ে আহসা অঞ্চলের (১০০০ হিজরীতে) কাজী ছিলেন।

২. শায়খ মোহাম্মাদ বিন আলী আল-ওয়াইজ আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । তিনি এগারোশত হিজরীর একজন প্রসিদ্ধ স্কলার ছিলেন। তৎকালীন সময়ে সেই এলাকার বিচারপতি ছিলেন।

৩. শায়খ মোহাম্মাদ বিন ইমাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ। তিনি এগারোশত হিজরীর শেষ ও বারোশত হিজরীর প্রথম দিকে আহসার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। পাশাপাশি একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ হিসেবে খ্যাতী লাভ করেছিলেন। তার বেশ কয়েকটি ফতোয়ার বইও রয়েছে।

৪. শায়খ আব্দুল মালীক বিন আব্দুল্লাহ বিন আলী আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । তিনিও তৎকালীন সময়ের একজন খ্যাতিমান কাজী ও মুফতি ছিলেন।

৫. শায়খ মোহাম্মাদ বিন আহমাদ মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । তিনি তৎকালীন সময়ের একজন সু-প্রসিদ্ধ আলিমে-দ্বীন ছিলেন। সৌদি আরবের বর্তমান প্রসিদ্ধ মসজিদ " জামিউশ শুয়ূখ " এর ইমাম ছিলেন, যে মসজিদটি ইলম ও হালকার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো। ১০৪৪ হিজরীতে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

৬. শায়খ উমার বিন আহমাদ আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । যিনি তৎকালীন সময়ে আহসা অঞ্চলে বেশ কিছু মসজিদ, মাদ্রাসা ও বিভিন্ন আওকাফ প্রতিষ্ঠা করে তিনি নিজেই সেগুলার দেখাশোনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ইলম বিতরণ করেন।

৭. শায়খ কাজী আব্দুর রাহমান বিন উমার মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । যিনি আহসার প্রধান বিচারপতি ছিলেন বারোশত হিজরীর শেষ দশকে।

৮. শায়খ কাজী মুফতি মোহাম্মাদ বিন উমার মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । তিনি আহসার প্রধান মুফতি ও কাতীফ অঞ্চলের প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ বই রচনাও রয়েছে। তন্মধ্যে -

١ - نيل المرام لمن تولى القضاء والأحكام

٢-القول المبرم الذي ليس لإبرامه نقض في حكم إجارة العقار قبل القبض

٣- مقامة الطيب في الأدب

৯. আল্লামা শায়খ আবু বাকর বিন মোহাম্মাদ বিন উমার মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ । তৎকালীন সময়ের একজন খ্যাতিমান আলিম ও লেখক ছিলেন। তার বেশ কিছু লিখিত বই রয়েছে। তন্মধ্যে -

١-الزهر العاطر بتلخيص صيد الخاطر

٢- قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة لابن الجوزي

٣- منظمة تحفة الطلاب في الفقه

٤- منظومة منهاج السلوك

٥- إتحاف الطالب فى الفقه الحنفى

১০. শায়খ আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন শায়খ আবু বাকর মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ। তিনিও তৎকালীন সময়ের একজন খ্যাতিমান দাঈ, লেখক, শিক্ষক ও তাজকিয়া লাইনের ধারক-বাহক ছিলেন। তার বেশ কিছু বই ও রয়েছে। তন্মধ্যে -

١- قلائد الذهب شرح وسيلة الطلب في الفقه

٢-قمع المعاند في انتهاك حرمة المساجد

٣- مختصر في ترجمة والده

১১. শায়খ কাজী মুফতি আব্দুল লাতীফ বিন আব্দুর রাহমান আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ। সেই সময়ের সবচেয়ে বড় মুফতি ছিলেন। আহসা অঞ্চলের সবচেয়ে লম্বা সময়ের কাজী ছিলেন। তার বিচার কার্য প্রায় ৩০ বছর ছিল। এছাড়াও, তিনি ফতোয়া ও কিতাব তাসনীফে পারদর্শী ছিলেন। তার উল্লেখ্য বই -

١- وسيلة الظفر في المسائل التي يفتي فيها بقول زُفَر

٢- نيل المرام بشرح كفاية الغلام

وكلاهما مطبوعان بتحقيق حفيده عبد الإله

১২. শায়খ আবু বাকর বিন শায়খ আব্দুল্লাহ আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ। তেরশ হিজরীর অন্যাতম একজন আলিম ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বেশ কিছু মসজিদ-মাদ্রাসার দায়িত্বে ছিলেন। উসমানী শাসনামল ও সৌদি প্রতিষ্ঠাল্লগ্নে তিনি একজন খ্যাতিমান মুফতি ও কাজী ছিলেন।

১৩. শায়খ আহমদ বিন শায়খ আব্দুল লাতীফ আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ। তিনি সৌদি প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সৌদি সকল প্রসিদ্ধ শায়খ থেকে ইলম শিক্ষা লাভ করেছেন। আহসায় মাসজিদে মোল্লা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মাদ্রাসাতু কুব্বার দায়িত্ব পালন করেন। তিনিও একজন খ্যাতিমান লেখক ও শিক্ষক ছিলেন।

১৪. শায়খ মোহাম্মাদ বিন আবি বাকর আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ। আহসা অঞ্চলের একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। পবিত্র মক্কাতুল মুকাররামা থেকে ইলম অর্জন করে পারিবারিক সকল মসজিদ-মাদ্রাসার দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি একজন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য-

١- اللفظ المعقول في علم الأصول

٢-سلم المريد في علم التجويد

٣ شرح متن الآجرومية في النحو.

১৫. শায়খ আব্দুর রাহমান বিন আবু বাকর আল-মোল্লা রাহিমাহুল্লাহ। সমকালীন সময়ের একজন প্রসিদ্ধ মুফতী ও মুহাদ্দীস। পবিত্র মক্কাতুল মুকাররামায় পড়াশোনা করে সেখানে কিছুদিন ইলমে দ্বিনের খেদমত আঞ্জাম দেন এবং পরবর্তীতে নিজের বাপ-দাদার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদ্রাসার দায়িত্ব আঞ্জম দেন। তার উল্লেখ্য দু'টি বই -

١- مجموعة من الرسائل في الحديث والفقه

٢- ديوان شعر.

সম্মানিত পাঠক,

উনারা ছিলেন সৌদি আরবের আহসা অঞ্চলের মাত্র একটা পরিবারের (১০০০-১৩০০) হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম। এছাড়াও, সেই অঞ্চলের হানাফী অনেক স্কলার ছিলেন । যেমনঃ

১. শায়খ রাশেদ আল-মুরাইখী আল-হানাফী

২. শায়খ রাইদ আব্দুল্লাহ আল-হানাফী

(উনার প্রসিদ্ধ বই হচ্ছে - আল-মুখতাসারু ফিল কাওয়াইদিল ফিকহীয়াহ)

৩. ইব্রাহীম বিন হাসান মোল্লা আল-হানাফী

(উনার প্রসিদ্ধ বই হচ্ছে - হেদায়াতুন নাসিকী ইলা মা'রেফাতে আদাবিল মানাসিকি)

৪. ইয়াহয়া বিন শায়খ মোহাম্মাদ বিন আবু বাকর আল-হানাফী।
(উনার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে - হেদায়াতুল মুহতাজী লি-শামাইলে তিরমিজী)

প্রিয় পাঠক,

আলোচনা হচ্ছিল সৌদি আরবের আহসা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী " মোল্লা পরিবারের " হানাফী স্কলারসদের পরিচয় নিয়ে। ইতোপূর্বে যাদের নাম উল্লেখ হয়েছে, সবাই ছিলেন সেই যুগের!

এই ঐতিহ্যবাহী পরিবারে আমাদের সময়েও অনেক বড় স্কলার বের হয়েছেন। যাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নয়। যেমন -

১. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান আল-মোল্লা হানাফী রাহিমাহুল্লাহ । তিনি ১৩৩০ হিজরীতে সৌদি আরবেই জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জীবনের প্রথম দিকে আহসা। মক্কায় পড়াশোনা করলেও শেষ পড়াশোনা ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে সমাপ্তি করেন।

দেওবন্দ থেকে পড়াশোনা শেষ করে নিজেদের বাপ-দাদা প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সমূহের তাদরিসি দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি আহসা অঞ্চলের সর্বপ্রথম প্রকাশনা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম হচ্ছে - মাকতাবাতুত তা'আউনি আস-সাকাফিউ (مكتبة التعاوني الثقافي)

২. শায়খ মোহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবু বাকর মোল্লা হাফিজাহুল্লাহ। ১৪২২ হিজরীতে পবিত্র আহসা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বর্তমানে মাসজিদে কানবরীতে বিভিন্ন হালাকাত এর আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তার শিক্ষকতায় রয়েছে ফিকাহ, হাদিস, উসূল, আদব ও তারিখ ইত্যাদি।

৩. শায়খ ইয়াহয়া বিন শায়খ মোহাম্মাদ বিন আবু বাকর আল-মোল্লা হাফিজাহুল্লাহ। ঐতিহ্যবাহী মোল্লা পরিবারের বর্তমান ইলমি কর্ণধার । যিনি আহসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীয়া বিভাগ হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন খেদমতে দায়িত্বরত রয়েছেন। বিবিধ হালকা, মাজাল্লাহ,

তাসনীফাত ইত্যাদি সহ অগণিত তার খেদমত রয়েছে। বিশেষত, হানাফী মাজহাবের খেদমতে তার অসামান্য অবদান রয়েছে।

সম্মানিত পাঠক,

মোল্লা পরিবারের অন্যতম ইলমী কর্ণধার শায়খ আবু বকর বিন মোহাম্মাদ আল-মোল্লা আল-হানাফী আল-আহসা'ঈ এর হানাফী মাজহাব নিয়ে খেদমতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই তুলে ধরছি,যা সারা বিশ্বে ইলম-প্রিয় মানুষের কাছে সমাদৃত -

١ - هداية المحتذي لشمائل ترمذي (اعتنى به

٢- تحفة المبتدئ (في الفقه الحنفي

٣- منهاج الراغب إلى إتحاف الطالب في الفقه الحنفي

٤- زواهر القلائد على مهمات القواعد - أصول الفقه الحنفي

٥- إسعاف أهل العبادة بنص الصلاة على السجادة - مباحث الفقه الحنفي

ঐতিহ্যবাহী এই হানাফী পরিবারের অনেক সমাদর রয়েছে সেই অঞ্চলে। রয়েছে ইলম ও আমলে অনেক খ্যাতি। দারস-তাদরীসেও রয়েছে অগণিত অবদান। সেই অঞ্চলে তাদের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্রাসা রয়েছে। বিশেষত, হানাফী ফিকহের উপর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাও সেখানে রয়েছে।

সৌদি আরবের আহসা অঞ্চলে তাদের প্রতিষ্ঠিত হানাফী মাজহাবের তিনটা মাদ্রাসা রয়েছে।

১. আল-মাদ্রাসাতুল হানাফীয়্যাহ

২. মাদ্রাসাতুশ শারীয়াহ আল-হানাফীয়াহ

৩. মাদ্রাসাতু শায়খ আবু বাকর আল-মোল্লা আল-হানাফী

শেষ কথা,

সু -হৃদ পাঠক।

মনে আছে কোন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে ?

জ্বি, হ্যা আলোচনা চলছে - সৌদি আরবে কি হানাফী মাজহাবের আলিম-উলামা আছেন ?

বাংলাদেশের চেয়ে তেরোগুণ বড় বিশাল এই রাষ্ট্রের সকল আলিম-উলামার পরিচয় বা তাদের মাজহাব জানা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আহসা অঞ্চলের মাত্র একটা পরিবারের হানাফী আলিম-উলামার উল্লেখ্য কিছু স্কলারের পরিচয় দিলাম, যারা যুগ যুগ ধরে কোর'আন -হাদিসের খেদমতের পাশাপাশি হানাফী মাজহাবে অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন। এছাড়াও, আমার জানাশোনা মতে অসংখ্য সৌদি শায়খ রয়েছেন, যারা হানাফী মাজহাবকে অনুসরণ করছেন। অথচ, দিন-শেষে কিছু সংখ্যক শায়খ থেকে শুনবেন যে, সৌদি আরবে মাজহাব বলতে কিছু নাই ।

সহীহ হাদিস পাইলেই কি আমলযোগ্য হয়ে যায় ?

Details

আমাদের অনেক প্রিয় দ্বীনি ভাই আছেন , যারা বলেন- আমরা কেবল সহীহ হাদিস পাইলে আমল করি; অন্য কিছু নয় ! কথাটা অত্যন্ত সুন্দর । তব এখানে বুঝার একটু ঘাটতি আছে । হাদিস শুধু সহিহ হলেই চলবে না , বরং আমলযোগ্য কি না , তাও দেখতে হবে । এ নিয়ে ছোট্ট একটা বিতর্ক ও আলোচনা পড়ে নিন ।

কিছুদিন পূর্বে একজন লা-মাজহাবী ভাই এসে আমাকে বললেন -

ভাই, আমরা তো কেবল সহীহ হাদিস পাইলে মানি। অন্য কিছু নয় !

আমি তখন বললাম -

বাহ, বেশ ভালো তো ! আচ্ছা, আমাকে কি তিরমিজী শরীফের ১৮৭ নং হাদিসটা দেখে কিছু জানাবেন ?

তিনি বললেন -

হাদিসটিতে লেখা - রাসুল (সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভয় অথবা বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়া মদীনাতে জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করেছেন ।

আমি তখন বললাম -

আচ্ছা ভাই, আপনি এই হাদিস অনুযায়ী প্রতিদিন আমল করছেন তো ?

তিনি বললেন -

নাহ, এটার উপর আমল করছি না।

আমি তারপর বললাম -

কেন ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো সহজ করে দিয়েছেন । কি দরকার আমাদের জোহরের জন্য আলাদাভাবে বিরতি দেওয়ার, আমরা আসরের সময় এক সাথে জোহর ও আছর পড়ে নিব । এবং এশার সময় এক সাথে মাগরিব ও এশা পড়ে নিব ।

আরো দেখুন, হাদিসের শেষে এটাও লেখা আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বলেনঃ

উম্মতের অসুবিধা হ্রাস করাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্য ছিল । তো কেন আপনি চার ওয়াক্তে চার নামাজ পড়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন, দুই ওয়াক্তে চারটা পড়ে নিন।

তিনি বললেন -

এটা হয়তো সফরের সময় নামাজের কথা বলেছেন।

আমি বললাম -

নাহ, দেখেন ! হাদিসেই লেখা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদীনাতে মুকীম ছিলেন। সফরে নয়। আর হাদিসটি ইমাম তিরমিজী রাঃ সফরের অধ্যায়েও আনেন নি। তাহলে এটা সফরের সময়ের জন্য হবে কেন ?

তিনি বললেন -

আচ্ছা, তাহলে আমি পরবর্তীতে জেনে আপনাকে জানাচ্ছি।

অতঃপর, ভাইটি গতকাল এসে আমাকে বললেন যে, ইমাম তিরমিজি রাঃ কিতাবুল ইলালে বলছেনঃ

এই হাদিস অনুযায়ী আমল করা যাবে না।

আমি বললাম -

ইন্না লিল্লাহ! এ কি কন ভাই ? আপনি তো দেখি আমাদের মতো মুকাল্লিদ হয়ে গেলেন! আমি আপনাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহীহ হাদিস পেশ করেছি। আর আপনি আমল করছেন ইমাম তিরমিজীর কথা। আপনি সহীহ

হাদিস এর উপর আমল বাদ দিয়ে ইমাম তিরমিজী রাঃ এর কথার উপর আমল করছেন কেন ?

আমি আরো বললাম -

ভাই দেখেন, আমরা যখন এরকম ব্যাপারে ইমাম আজম আবু হানীফা রাঃ এর গবেষণালব্ধ মতামত গ্রহণ করি, তখন আপনারা আমাদেরকে হানাফী মুকাল্লিদ বলে গালি দেন। অথচ, আপনারাই আবার চাপে পড়ে ইমাম তিরমিজীর তাকলীদ করলেন?! আমাদের তাকলীদ করা অবৈধ হলে, আপনাদের তাকলীদ করা বৈধ কেন ? কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডবাজি ?

আমি তখন আরো বললাম -

ভাই দেখেন, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রঃ ফাতহুল বারীতে ১/৩৯৭ লিখেছেনঃ "এমন বহু হাদিস আছে, যেগুলো সহিহ কিন্তু মানসুখ হয়ে গেছে ।"

আর আপনি যেই কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে বললেন, সেখানে ইমাম তিরমিজি রঃ এটাও বলেছেন যে, ফুকাহায়ে কেরামই হাদিসের অর্থ সব থেকে ভালো বুঝেন !

পরিশেষে এ কথাও বললাম, আপনারা আর আমাদের পার্থক্য হচ্ছে, আমরা শ্রেষ্ঠ ফোকাহাগণের তাকলীদ করি আর

পরিশেষে এ কথাও বললাম, আপনারা আর আমাদের পার্থক্য হচ্ছে, আমরা শ্রেষ্ঠ ফোকাহাগণের তাকলীদ করি আর আপনারা মন-চাহিদা যখন-তখন যে কোন শায়খের তাকলীদ করেন।

বিঃদ্রঃ- শায়খ মুফতী বেলাল বিন আলী (হাফিজাহুল্লাহ) এর বর্ণিত ঘটনাবলম্বে ঈষৎ সম্পাদিত ও পরিমার্জিত !

এছাড়া যে কোন হাদিস পাইলেই আমলযোগ্য মনে করার আগে, নিচের লেখাটা পড়া প্রয়োজন । তবে আশা করি বিষয়টি আরো ক্লিয়ার হবে, ইনশাআল্লাহ !

হাদিস শাস্ত্রকে অনুগ্রহ করে পান্তা ভাত মনে করবেন না। কোন হাদিস সহীহ হলেই, এর সমাপ্তি মনে করবেন না। কোন হাদিস জঈফ হলেই, এর নিঃশ্বাস ত্যাগ ধারণা করবেন না।

আমরা তো অনেকেই মনে করি, একটা হাদিস সহীহ হওয়া মানেই আমল শুরু। আগ-পিছ কিছু ভাবার সুযোগ নাই কিংবা কোন ফকীহ ও মুহাদ্দিসের কথা শুনার প্রয়োজন নাই।

অথচ প্রিয় ভাইয়েরা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন অনেক সহীহ হাদিস আছে, যা একাধিক অর্থ/উদ্দেশ্য এর সম্ভাবনা রয়েছে। এমনও অনেক হাদিস আছে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নির্দিষ্ট করেছে, আবার কখনো অনির্দিষ্ট করেছেন।

যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ বলেন -

والأحكام يبينها ' تارة بصيغة عامة وتارة بصيغة خاصة.

অনুবাদ -

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক হুকুম-আহকাম কখনো ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ দ্বারা কখনো বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ দ্বারা বলেছেন।"

সূত্র -মিনহাজুস সুন্নাহ ১/৩০৯

একটা হাদিসের একাধিক ব্যাখ্যা ও অর্থের সম্ভাবনা রাখে, যা বিবিধ দিক বিবেচনায় জাজ করতে হয়। একজন সাধারণ পাঠকের জন্য শুধু হাদিসের বাংলা পড়েই ফাইনালাইজ করা মোটেও ঠিক না। বরং, ফোকাহা ও মুহাদ্দিসের ব্যাখ্যা জানা অতীব জরুরি। নতুবা, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হতে পারে।

যেমনটি, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম আবু ইউসূফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন -

ولحديث رسول الله' معاني، ووجوه، وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী অনেক অর্থ-সমৃদ্ধ, বিভিন্ন দিক ও ব্যাখ্যা পূর্ণ হয়। আল্লাহ তাআলা যাকে যোগ্যতা দান করেন, কেবল সে ব্যক্তি তা হৃদয়ঙ্গম ও তার গভীরে পৌছতে সক্ষম হয়।"

সূত্র -আররাদ্দু আলা সিয়ারিল আওযায়ী পৃ. ১৪

দেখুন, মুহাদ্দিসগণ বলছেন- একটা হাদিসের কত অবস্থা হতে পারে। অথচ আমরা অনেকেই হাদিসের বাহ্যিক দেখেই আমল শুরু করি আর বিপরীত মতকে বাতিল স্বীকৃতি দিয়ে থাকি।

হাদিস সহীহ হওয়া একটা পার্ট বটে। তবে, হাদিসের সবকিছু না। একটা হাদিসের অনেক বিষয় থাকে। তারপর, আমল করতে হয়। যেমন -

১. হাদিসের সনদ ও মতনের বিশুদ্ধতা

২. হাদিসের সু-স্পষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য উদঘাটন করা

৩. হাদিস নাসিখ-মানসুখ কি না, তা যাচাই করা

৪. হাদিসের বৈপরীত্য আছে কি না, তা দেখা

৫. হাদিসটা রাসূলের জন্য খাস কি না, তা যাচাই করা

ইত্যাদি সব যাচাই-বাছাই শেষে একটা হাদিসের উপর মুহাদ্দিস ও ফোকাহাগণ আমলি ফায়সালা করে থাকেন। অথচ, আমরা অনেকেই মনে করি, হাদিস সহীহ হলেই সব শেষ। আর কোন কিছু দেখার দরকার নেই।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন মিলে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা রাহঃ এর একটা বক্তব্যে -

فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثير

“বহু হাদীস এমন আছে যা বিশুদ্ধ কিন্তু তার অর্থে রয়েছে অনেক মতানৈক্য।”

সূত্র -নাকদু মারাতিবিল ইজমা পৃ.৩০৪

এবার চিন্তা করুন,

যেখানে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ বলছেন, হাদিস সহীহ হওয়ার পরেও মতানৈক্য থেকে যায়, অথচ আমরা অনেকেই হাদিস সহীহ দেখার পরেই আমলের জন্য যথেষ্ট মনে করি, যা সঠিক পদ্ধতি নয় !

সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে ফতোয়া দিতেন ?

Details

এক নজরে জেনে নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম রাঃ কিভাবে ফতোয়া দিতেন।

একদা এক ব্যক্তি ইবনে উমার রাঃ কে এক মাস'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনে উমার রাঃ মাস'আলা শুনে মাথা নিচু করে রইলেন, প্রশ্নকারীর কোন উত্তর দিচ্ছিলিনেন না। প্রশ্নকারী ধারণা করলেন যে, ইবনে উমার রাঃ হয়তো তার মাস'আলাটির জিজ্ঞাসা শুনেন নাই।

ফলে, লোকটি ইবনে উমার রাঃ কে বললেনঃ

আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুক, হে ইবনে উমার, আপনি কি আমার মাস'আলা শুনেন নাই ?

ইবনে উমার রাঃ বললেন -

অবশ্যই, শুনেছি ! তবে, আপনারা মনে করেন যে, আপনারা আমাদেরকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন, সে বিষয়ে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন না !

ইবনে উমার রাঃ আরো বললেন -

বিষয়টি আমাদের উপর ছেড়ে দিন। আমরা বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করবো। যদি আমাদের কাছে যথোপযুক্ত উত্তর থাকে, তাহলে আপনাকে জানাবো। আর যদি কোন উত্তর না পাই, তাহলে বলবো এই বিষয়ে আমাদের কাছে কোন ইলম নাই। সূত্র -) طبقات ابن سعد ط العلمية 4/126(

আল্লাহু আকবার!

এবার চিন্তা করুন, জলিলুল কদর সাহাবী ইবনে উমার রাঃ ফতোয়ার ব্যাপারে কতইনা সতর্ক ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাঃ কখনো ফতোয়া দিয়ে দায়মুক্তি মনে করতেন না। তাঁরা ফতোয়া প্রদানে আল্লাহকে ভয় করতেন। আল্লাহর জিজ্ঞাসার ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। পূর্ণাঙ্গ পাকাপোক্ত না হয়ে কখনো কোন ফতোয়া দিতেন না।

উল্লেখ্য, ফতোয়া মানেই কোর'আন-হাদিসের দলীল থাকলেই বলে দেওয়া নয়। বরং, প্রশ্নকারীর অবস্থা, পরিবেশ ও সময় ইত্যাদি বিবেচনা করতঃ কোর'আন-হাদিস ও ফতোয়ার মূলনীতির আলোকে সমাধান দেওয়াকে ফতোয়া বলে।

ইবনে জামা'আহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন –

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ সাহাবী তো খুব কমই ফতোয়া দিতেন। এমন অনেক সাহাবী আছেন, যাদের জীবদ্দশা থেকে মাত্র দু'একটি ফতোয়ার কথা জানা যায়। অধিকাংশ সাহাবী'ই সতর্কতাবশত ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকতেন।

সূত্র - تذكرة السامع والمتكلم ص 23

রাসুল ও সাহাবাদের মাজহাব কি ছিলো ?

Details

সুবহানাল্লাহ ! মাজহাব বিদ্বেষ মানুষকে কতটুকু নিচে নামাতে পারে , এরকম দু একটা প্রশ্নে আমরা বুঝে যাই । আমাদের এমন অনেক ভাই আছেন , যারা কখনো প্রশ্ন করেন- মাজহাব মানব; তবে রাসুল কার মাজহাব মানতেন ? সাহাবারা কার মাজহাব মানতেন ?

অথচ , একজন মুসলিম মাত্রই জানা থাকার কথা ছিলো যে , রাসুলের মাজহাব তো ওহি ছিলো । তিনি ওহির বাহিরে তো কিছুই বলতেন না , যা কোরানই স্বাক্ষ্য দেয় । আর সাহাবাদের মাজহাব ? এ তো আরেক বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন ! তারা তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন। যেখানে দরকার হয়েছে, তা রাসুলকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে জেনেছেন । আর রাসুলের অবর্তমানে সিগার সাহাবীগণ কিবার সাহাবী থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছেন । কখনো কিবার সাহাবিগণ নিজে নিজেই ইজতিহাদ করেছেন । এসবের উদাহরণ তো বুখারিতেও রয়েছে । তবুও আমাদের ভাইয়েরা এমন প্রশ্ন কেন করেন , তা আমার বোধগম্য নয় ।

যাহোক , এমন কিছু বিষয়ে একটা বিতর্কের সারাংশ নিচে তুলে ধরলাম , যা আপনাদেরকে মূল আলোচ্য বিষয় বুঝতে আরেকটু সহায়তা করবে , ইনশাআল্লাহ।

বিতর্কের এক পর্যায়ে তিনি বললেন -

রাসূলের মাজহাব কি ছিল?

আমি বললাম -

রাসূলের মাজহাব ওহী ছিল।

তিনি আবার বললেন -

তাহলে সাহাবাদের মাজহাব কি ছিল?

আমি বললাম -

সাহাবাদের মাজহাব স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন।

তিনি এবার বললেন -

তাহলে আমাদের মাজহাব ভিন্ন কেন ?

আমি বললাম -

কারণ, আমাদের উপর যেমনি ওহী আসবে না, তেমনি সাহাবাদের মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি জিজ্ঞেস করার আর সুযোগ হবে না।

তিনি পুনরায় বললেন -

ওহী নাজিল না হলে কি হবে, রাসূলকে না পেলে কি হবে -- কোরআন এন্ড হাদিস তো আছে ?

আমি বললাম -

কোরআন হাদিস থেকে সরাসরি মাসালা-মাসাইল বর্ণনা করার যোগ্যতা তথা ইজতিহাদের যোগ্যতা তোমার আছে? তাহলে তোমার জন্য মাজহাব না। আমার মোটেও এই যোগ্যতা নাই, তাই আমি ফোকাহাদের মাজহাব মানি। তাদের ইজতিহাদ নিয়ে পড়াশোনা ও জানাশোনা করে সঠিকভাবে কোরআন-সুন্নাহর উপর আমল করি।

তিনি অবশেষে - আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আর আমি - উনার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় নিয়োজিত হলাম - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সহ আমার এই ভাইকে সঠিক বুঝ দান করো।

পরবর্তীতে -

ভাইটি কি যেন ভেবে পূনরায় ইনবক্সে এসে বললেন - আসলে ভাই, লা-মাজহাব এসে ফিৎনা তৈরী করেছে। আমলে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করেছে। আমি এখন মাবনসিক রোগ থেকে বাঁচতে চাই।

আমি বললাম -

প্রিয় ভাই! আমি সেটা আগেই বলেছি। আমার পক্ষে ইজতিহাদ করা সম্ভব না। তাই আমি মাজহাব মানি, তাঁদের মতামতকে সামনে রেখে রাসূলের সুন্নাহর উপর আমল করি। ফলে আমার আমলিয়্যাতে কোন ওয়াসওয়াসা নাই। আমার ব্রেইনে কোন মানসিক রোগ নাই, আলহামদুলিল্লাহ। আর এটাই ছিল মূলত মাজহাবের শিক্ষা যে, মানুষ কোরআন-হাদিসের সঠিক নির্দেশনা মানতে গিয়ে যাতে অথৈ সাগরে হাবুডুবু না খায়, ওয়াসওয়াসা রোগে না পায়। সেজন্য যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামগণ উম্মাহর জন্য শান্তির ধারা রেখে গেছেন। আর তা হলো- শারীয়াহর সু-বিন্যস্ত ও ওয়াসওয়াসা মুক্ত মত ও পথ, যা মাজহাব নামে পরিচিত।

অপর পাশ থেকে ছোট্ট একটা খুশীর সংবাদ এলো -

ভাই! তাহলে আজ থেকে আমিও আপনার মতো একই পথ ধরলাম !

আলহামদুলিল্লাহ - আলা কুল্লী হাল

মাজহাবের ইমামদের কাছে কি হাদিস পৌঁছে নাই ?

Details

আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত কয়েকটি ভুল ধারণা / কথা আছে। যেমন,

১ - মাজহাবের ইমামগণ ফকীহ। মুহাদ্দিস ছিলেন না।

২ - মাজহাবের ইমামগণ পর্যাপ্ত হাদিস জানতেন না।

৩ - মাজহাবের ইমামদের নিকট সব হাদিস পৌঁছে নাই।

মোটামুটি, এই ধরণের বেশ কিছু কথাবার্তা বা প্রচলিত ভুল ধারণা আমাদের সমাজে বিস্তার করেছে। নতুন দ্বীনে ফিরে আসা ভাইদের নিকট থেকে এমন প্রশ্ন প্রায়শই পাওয়া যায়।

আর প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার, যেখানে দ্বীনের পথে নতুন চলা ভাইদের সামনে খুব রসেভরা উপস্থাপনা দিয়ে বলা হয় -

" দেখো, মাজহাবের *ইমামগণ তো ৮০ হিজরী থেকে নিয়ে ২৪১ হিজরীর ভেতরেই ইন্তেকাল করেছেন। আর বুখারী, মুসলিম সহ সকল হাদীস গ্রন্থ এর পরে সংকলিত হয়েছে। তাহলে ইমামগণ এসব হাদিস পাবেন কি করে? "*

এমন যৌক্তিক বক্তব্যে সরলমনা যে কেউ অতি সহজে বিভ্রান্ত হতে পারেন। প্রকৃত ইতিহাস ও তারিখু শারীয়াহ জানা না থাকলে এমন বর্ণনায় সহজে ধোঁকা খাওয়া মামুলি ব্যাপার।

যাহোক, এমন উদ্ভট ও আজগুবি কথা যারা প্রচার করে সরলমনা দ্বীনি ভাইদের কাছে তথ্য-বিভ্রাট করে প্রকৃত ইতিহাস গোপন করেছেন, তাদের পরিচিতি ও কিছু বক্তব্য তুলে ধরি।

উপরোক্ত তথ্য-বিভ্রাট কথা বাংলাদেশের অনেক শায়খ প্রচার করে থাকেন। সবার আলোচনা তুলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব না। তবে অন্তত একজনের বক্তব্য অত্যন্ত সম্মানের সাথে তুলে ধরছি।

বাংলাদেশের সালাফী ও আহলে হাদিস ভাইদের অত্যন্ত আস্তাভাজন একজন শায়খ (হাফিজাহুল্লাহ) বলেন - (সঙ্গত কারণে নাম উল্লেখ করছি না)

" প্রসিদ্ধ মহামতি চার ইমাম ৮০-২৪১ হিজরীতে আগমন করেছেন এবং এই সময়টাতেই তারা বিদায় নিয়েছেন। তাদের অধিকাংশের সময়টা ছিল এমন, যখন প্রসিদ্ধ ছ'টি হাদীসগ্রন্থ পূর্ণভাবে সংকলিত হয়নি। বিশেষকরে, ইমাম আবু হানীফা, মালেকী ও শাফেয়ীর সময়কালে ঐ প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থগুলোর

" প্রসিদ্ধ মহামতি চার ইমাম ৮০-২৪১ হিজরীতে আগমন করেছেন এবং এই সময়টাতেই তারা বিদায় নিয়েছেন। তাদের অধিকাংশের সময়টা ছিল এমন, যখন প্রসিদ্ধ ছ'টি হাদীসগ্রন্থ পূর্ণভাবে সংকলিত হয়নি। বিশেষকরে, ইমাম আবু হানীফা, মালেকী ও শাফেয়ীর সময়কালে ঐ প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থগুলোর সূচনাই হয়নি বরং অনেকের জন্মই হয়নি। যার ফলে তাদের হাতের নাগালে সকল হাদীস পাওয়া সম্ভব ছিলো না। "

সূত্র - সুন্নাতে রাসূল ও চার ইমামের অবস্থান ৯৩

শায়খ আরো বিস্তারিত লিখে বুঝতে চেয়েছেন যে, যেহেতু ইমামদের সময়ে হাদীস সংকলন হয়নি, তাই তাদের নিকট সব হাদিস পৌঁছেনি ।

কথাটা তো চমৎকার! ইমামগণের জ্ঞানের পরিধি ও হাদীস চর্চার ইতিহাস কারো অজানা থাকলে শায়খের বক্তব্য যথার্থ ও যৌক্তিক মনে হতে পারে। তবে একজন হাদিসের নিম্নমানের ছাত্র বা শারীয়ার যে কোন অনুসন্ধানীর কাছে বক্তব্যটি নিছক হাস্যরসে গৃহীত বৈ কিছু না।

আমি বক্ষমান লেখায় এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব না যে, প্রত্যেক ইমাম হাদিসের ব্যাপারে কি পরিমান পান্ডিত্ব লাভ করেছেন বা তাদের কাছে কি পরিমাণ হাদিস মজুদ ছিল। কেননা এটা বিস্তর বিষয় !

শায়খ হাফিজাহুল্লাহ এর বক্তব্যের জবাবে আমি , ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাঃ এর একটা বক্তব্যে নিচে তুলে ধরছি। এতে শায়খের কথার যেমন জবাব রয়েছে, তেমনি ইমামগণ হাদিসের

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তার ফাতোয়া গ্রন্থে বলেন -

" بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا اعلم بالسنة من المتأخرين بكثير ، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية "

সরল অনুবাদ -

" হাদীস ও সুন্নাহর এসব গ্রন্থ সংকলনের পূর্ববর্তী ইমামগণ পরবর্তীগণণের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক বেশী জানতেন। *তাদের গ্রন্থ তো ছিল - তাদের সীনা, যাতে এসব গ্রন্থের তুলনায় হাদীস ও সুন্নাহ অনেক বেশী পরিমানে সংরক্ষিত ছিলো। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয় জ্ঞাত কেউ সন্দেহকরতে পারে না। "*

সূত্র - মাজমুউল ফতোয়া ২০/২৩৯

সম্মানীত পাঠক,

কি বুঝলেন ? শায়খুল ইসলামের উদ্ধৃতি থেকে আপনাদের কি অনুমিত হলো ? যাদের বক্ষই ছিলো হাদীসের গ্রন্থ, তারা নাকি হাদীস জানতেন না ? তাদের নিকট নাকি পর্যাপ্ত সহীহ হাদীস পৌঁছে নাই ?

আসলেই কি বিষয়টা এমন ? নাকি শায়খুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ যেমন বলেছেন, তেমন ?

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান !

- রাসূল সাঃ 'আহলুস সুন্নাহ' হতে উৎসাহিত করেছেন

Details

বহুল পরিচিত দু'টি পরিভাষা - হাদিস ও সুন্নাহ। এ দু'টি টার্ম হাদিস শাস্ত্রের খুব প্রাথমিক লেভেলের ও প্রসিদ্ধ দু'টি নাম। আশাকরি, সকলের মৌলিকভাব এ নিয়ে মোটামুটি জানাশোনা আছে। তদুপরি, মূল বিষয়টি ফুটিয়ে তুলার সুবিধার্থে আমি প্রথমে হাদিস ও সুন্নাহ এর মাঝে মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরছি -

→ হাদীস

রাসূল সাঃ এর প্রতিটা কথা, কাজ ও মৌন স্বীকৃতিকে হাদীস বলে। হাদিসের মৌলিক দু'টা বৈশিষ্ট্য -

১. চাই সেটা রাসূল সাঃ এএ জন্য একক নির্দিষ্ট বিষয় হোক (যেমনঃ একাধীক বিবাহ) কিংবা উম্মাহের জন্য পালনীয় বিষয় হোক।

২. চাই সেটা মানসুখ (রহিত হুকুম) বিষয় হোক, কিংবা নাই হোক। সবগুলাকে হাদীস বলে।

→ সুন্নাহ

রাসূল সাঃ এর প্রতিটা কথা, কাজ ও মৌন স্বীকৃতিকে সুন্নাহ বলে। তবে সুন্নাহের ভিন্ন দু'টা মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে -

১. এমন বিষয় হতে হবে, যা রাসূল সাঃ এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো না, বরং উম্মাহের জন্য পালনীয়ও ছিলো।

২. এমন বিষয় হতে হবে, যা রাসূল সাঃ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার উপর আমল করে গিয়েছেন। অর্থাৎ, এমন বিষয় হলে হবে না, যা রাসূল সাঃ প্রথমে আমল করেছেন, পরে আবার বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এক কথায়, বিষয়টা মানসুখ (রহিত হুকুম) হতে পারবে না।

মোদ্দাকথায়, উপরের আলোচনা থেকে আমরা দু'টা বিষয় জানতে ও বুঝতে পারলাম -

১. হাদিস ও সুন্নাহ প্রায় একই । তবে সকল হাদিস উম্মাহের জন্য পালনীয় না। তবে প্রত্যেক সুন্নাহ উম্মাহের জন্য পালনীয়।

২. প্রত্যেক সুন্নাহই হাদীস, তবে প্রত্যেক হাদিস সুন্নাহ নয়। হাদিস হবে আ'ম (ব্যাপক) আর সুন্নাহ হবে খাস (নির্দিষ্ট) বিষয় ।

এবার চলে আসি মূল কথায় -

অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাদের ভাইদের প্রসঙ্গে বলছি ,যারা তাঁরা নিজেদেরকে ' আহলুল হাদীস ' নামে ভূষিত করতে পছন্দ করেন। কারণ, তাদের দাবী -

তারা সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাঃ এর বিশুদ্ধ হাদীসের উপর আমল ও পালন করেন। সে'জন্য তাঁরা আহলুল হাদীস

বিষয়টি চমৎকার ! মোটেও খারাপ কোন দিক না। তবে ছোট্ট একটা জায়গায় খটকা লেগে যায়। আমরা উপরের বিশুদ্ধ আলোচনা থেকে জেনেছি যে, রাসূল সাঃ এর প্রতিটা হাদিস আমাদের জন্য পালনীয় নয় ; বরং প্রত্যেকটা সুন্নাহ পালনীয় ।

যেমনঃ - দু'টা উদাহরণ দেই

১. ইফতার না করে ধারাবাহিক রোজা রাখা। এটাও একটা হাদিস ; তবে সুন্নাহ নয়। কারণ, এটা রাসূল সাঃ এর জন্য খাস ছিলো। উম্মাহের জন্য বৈধ নয়।

২. চারের অধিক বিবাহ করা। এটাও হাদিস ; তবে সুন্নাহ নয়। কারণ, চারের অধিক বিবাহ কেবল রাসূল সাঃ এর জন্য খাস ছিলো। উম্মাহের জন্য বৈধ নয়।

আশাকরি এবার স্বাবলীল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অকাট্য যুক্তি থেকে বুঝতে পেরেছেন যে, যে কোন মুসলিম সকল ' সুন্নাহ ' পালন করতে পারে। তবে সকল ' হাদিস ' পালন করতে পারে না। অতএব, একজন মূমীন-মুসলমান সকল সুন্নাহ পালনের বৈধতা নিয়ে সে " আহলুস সুন্নাহ " হতে পারে , তবে " আহলুল হাদীস " হতে পারে না। যেহেতু, রাসূল সাঃ এর সকল হাদিস উম্মাহের জন্য পালনীয় না। তবে আহলুল হাদিস পরিভাষা অপর অর্থেও ব্যবহার হয় , যারা হাদিস শাস্ত্রে বিজ্ঞ ও পন্ডিত। এমন অর্থে হাদিস বিশেষজ্ঞ হতে পারেন।

((মুহাদ্দিসীনদেরকেও আহলুল হাদিস বলা হয়, তবে তারা হাদীসের পারদর্শী হিসেবে। তারা রাসূলের হাদিস-সুন্নাহ সব নিয়ে গবেষণা করতেন। তাই তাদেরকে আহলুল হাদিস বলা হয়))

আসুন ! এবার জেনে নেই যে, রাসূল সাঃ হাদিস পালনে নাকি সুন্নাহ পালনে উৎসাহিত করেছেন -

১. মুসলিম শরীফের হাদিস, রাসূল সাঃ এরশাদ করেন - " তোমরা যদি তোমাদের নবীর সুন্নাহ তরক করো, তাহলে নিশ্চিত গোমরাহ হবে " (মুসলিমঃ২৫৭)

•

২. আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ এরশাদ করেন - " ছয় ব্যক্তির উপর আমি লা'নত করেছি। আল্লাহ তা'লা ও সকল সকল নবী লা'নত করেছেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী হলো - যারা আমার সুন্নাহকে তরক করে। " (তিরমিজীঃ ২১৪৫)

৩. রাসূল সাঃ বলেন - " তোমরা আমার সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আকড়ে ধরো। " (আবু দাউদঃ ৪৬০৭)

৪. রাসূল সাঃ বলেন - " যে আমার সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করলো, সে আমাকে মহব্বত করলো। আর যে আমাকে মহব্বত করলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (তিরমিজিঃ ২৬৭৮)

৫. রাসূল সাঃ বলেন - " উম্মাহের বিপর্যয়ের সময় যে আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে, সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে। " (মুজমা'উল আওয়াসাতঃ ৫৪১৪)

৬. রাসূল সাঃ বলেন - " সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে রাখা বিদ'আত উদ্ভাবন করা থেকে উত্তম। " (মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২০২)

৭. রাসূল সাঃ বলেন - " আমার মৃত্যুর পর, যে আমার কোন সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করবে আর ঐ সুন্নাহের উপর যারা আমল করবে, সে তাদের সম পরিমাণ সওয়াব পাবে। " (তিরমিজিঃ ২৬৭৭)

•প্রিয় পাঠক,

•আরো অসংখ্য-অগণিত হাদীস আছে, যেখানে রাসূল সাঃ সুন্নাহ পালনে ও আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করেছেন। যেহেতু সকল হাদীস আমাদের জন্য পালনীয় না ; তাই আমাদের জন্য " আহলুল হাদীস " বলা এতোটা মানায় না । বরং " আহলুস সুন্নাহ " বলা একদম যুৎসই ও যথাযথ । কারণ, আমরা সকল সুন্নাহ মানতে বাধ্য।

শেষ করছি একটা কথা দিয়ে, রাসূল সাঃ এর বিশুদ্ধ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এই উম্মাহ তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তবে একটা দল কেবল জান্নাতে যাবে৷ আর তা হলো - যারা আহলুস সুন্নাহ ছিলো।

চলুন, আমরাও সকল চিন্তা-মতাদর্শের উর্ধে গিয়ে - আহলুস সুন্নাহ হই। নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হই। আল্লাহ তা'লা সবাইকে সঠিক আহলুস সুন্নাহ এর মতাদর্শি হওয়ার তাওফীক দান করুক !

ওয়াল্লাহু আ'লাম বিস-সাওয়াব!